ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
অনূদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

আমাদের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিমিত্ত। লাখো দরূদ ও সালাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি, যাঁর আগমনে এ দুনিয়া ধন্য হলো এবং আমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র বান্দার পরিচয়ে সম্মানিত করলো।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান আর এ বিধান দুনিয়াতে আগমনের মুহূর্ত হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাগূতী শক্তির বাঁধার সম্মুখীন হয়ে আসছে। আম্বিয়াই কিরাম (আ)-এর মেহনত-মুজাহাদা ও কুরবানী, আসহাবুন নবী রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈনের জিহাদী জযবা, পীর-মাশায়েখ বুযুর্গ ও আলিমে দীনের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ইসলামের মর্মবাণী আজ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর বিভিন্ন সময়ের এসব ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞজনেরা সীরাত, মাগাযী ও ইতিহাস লিখে আমাদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন আলোকবর্তিকা হাতে পেতে। কিন্তু আজ সারা বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা যেভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে, সে সবের ওপরও আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে, কিন্তু কেউ এর সঠিক কারণ উদঘাটনে সক্ষম হয় নি। কী কারণে এককালের অর্ধ-জাহানের শাসকদের এ অধঃপতন, কিসের জন্য এ বিপর্যয় আর এ বিপর্যয়ের কারণে গোটা মুসলিম জাহানসহ সারা দুনিয়ারই বা কী ক্ষতি হচ্ছে? এসব বিষয়ের ওপর বলতে গেলে তেমন কেউ কলম ধরেন নি। গত শতাব্দী হতে আজ পর্যন্ত যত লেখক-গবেষক ও ইতিহাসবিদ এসেছেন ও বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সবার আগে যাঁর নাম এসে যায় তিনি হলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। আর তাঁরই লেখা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইতিহাসের এক অনন্য গ্রন্থ "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?" মূল বইটি আরবীতে লেখা যার নাম "মা-যা-খাসিরা'ল আলামু বি-ইন্‌হিতাতিল মুসলিমীন" ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে "Islam and the World" নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনূদিত হয়ে বইটি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

বাংলাদেশী মুসলমানদের হক ছিল বাংলা ভাষায় বইটি হাতে পাবার। আর সে হক আদায়ে আল্লাহ্ পাক আমার মত এক নগণ্য গুনাহ্গার বান্দাকে তৌফিক দিবেন তা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। এ আমার জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কীভাবে আর কোন ভাষায় আমি এর শুকরিয়া আদায় করতে পারি! কেবলই বলতে পারি আল-হামদুলিল্লাহ।

বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত এ বইটি সেই চাহিদা পূরণে "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো" নামে আজ প্রকাশ পেল। বইটি সর্বস্তরের পাঠকদের পিপাসার্ত মনের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি। সেই সাথে যাঁরা গবেষণারত ও ইতিহাসের ছাত্র, তাঁদের জন্য এ এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশাবাদী। বইটি প্রকাশ করতে যাঁরা আমাদের সহযেগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আল্লামা নদভী (র)-র সকল পুস্তক প্রকাশের লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মজলিস নাশরিয়াত ই-ইসলাম কর্তৃপক্ষ আমাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে শর্তসাপেক্ষে বইটি প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন। এই মুহূর্তে আগ্রহী পাঠকের স্বার্থে আমরা এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি। পাঠকের প্রয়োজন পূরণে এ প্রয়াস সফল হলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ পাক আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন এবং দোজাহানের কামিয়াবী দান করুন এটাই আমাদের এ মুহূর্তের একান্ত মুনাজাত।

– প্রকাশক

২৩ এপ্রিল, ২০০২ইং
ঢাকা।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা-র বর্তমান রেক্টর, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর সুযোগ্য ভাগ্নে ও স্থলাভিষিক্ত খলীফা হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী (দা.বা)-এর

বাণী

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এমন একজন আলেমে দীন ও দা'ঈ-এ ইসলামের জীবন অতিবাহিত করেছেন, যিনি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বহুমুখী প্রতিভা, যোগ্যতা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজের এসব প্রতিভা ও যোগ্যতা দ্বারা মুসলিম জাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিক্ষেপণ করে মুসলিম জাতিকে সেসব সংকট-সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব সমস্যা-সংকটের সে সম্মুখীন তিনি বিভিন্ন সংকট আত্মপ্রকাশের আগেই নিদর্শনাদিদৃষ্টে সেগুলো চিহ্নিত করেছিলেন যা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা-চেতনা এবং তাঁর নিজের জীবনে সেগুলোর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের যে চিত্র তিনি 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' নামক তথ্যবহুল গ্রন্থে অংকন করেছেন, পতনের পর পুনরুত্থানের জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন এবং পথ-প্রদর্শন করেছেন, বক্ষ্যমান গ্রন্থ অধ্যয়নে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বক্ষ্যমান গ্রন্থের মতই হযরত আল্লামা নদভী (র) প্রণীত আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে 'মুসলিম মামালিক মে ইসলাম আওর মাগরেবিয়াত কী কাশমাকাশ' (মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব)। এ গ্রন্থে চলমান মুসলিম বিশ্বের চিত্র পর্যালোচিত হয়েছে। অনুরূপ আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (জীবনপথের যাত্রী)। এ গ্রন্থে তিনি ভবিষ্যতে মুসলিম জাতির জীবনে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সংকট-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁর সব গ্রন্থ বিশেষত 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' এবং আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর এবং পথপ্রদর্শক দু'টি গ্রন্থ।

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (র) তাঁর সব গ্রন্থই আরবী অথবা উর্দু ভাষায় প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত সব গ্রন্থই সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণকর, কিন্তু অঞ্চল বিশেষে মুসলমানদের মাতৃভাষা বিভিন্ন। তাই

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মাতৃভাষায়ও তাঁর গ্রন্থাবলী অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয় যেন গ্রন্থগুলোর কল্যাণকারিতা অত্যন্ত বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়। ইংরেজী ও তুর্কী ভাষায় তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেরই অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও তাঁর বেশ কয়েকটি বই অনূদিত হয়েছে এবং আরও বইয়ের অনুবাদের কাজ চলছে। হযরত আল্লামা নদভী (র)-এর খলীফা মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব, পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং মাওলানা সালমান সাহেব বাংলাভাষায় হযরত নদভী (র)-এর বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ মনোযোগ দান করেছেন।

বক্ষ্যমান গ্রন্থ 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন'-এর অনুবাদ (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?) করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব। এ গ্রন্থখানা খুবই কল্যাণপ্রদ হবে বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করছি এবং বাংলাভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ এই মহৎ প্রচেষ্টা খুবই উপকারী হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ বইয়ের প্রকাশনার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন-- এ দোআই করছি । আমীন!

ইতি
মুহাম্মদ রাবে নদভী
নদওয়াতুল উলামা
লখনৌ, হিন্দুস্তান

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর যিনি তাঁর এই অধম বান্দাকে বহু কাঙ্ক্ষিত একটি কাজ সম্পন্ন করার তৌফীক দিলেন। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত আলিম, লেখক, চিন্তাবিদ ও খ্যাতনামা বুযুর্গ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) লিখিত 'মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতি'ল-মুসলিমীন'-এর উর্দূ অনুবাদ 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানূঁ কে উরূজ ও যাওয়াল কা আছর' নামক গ্রন্থের বাংলা তরজমা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারা এক বিরল সৌভাগ্য বলেই মনে করি। এজন্য আমি পরম করুণাময়ের দরবারে যতই শুকরিয়া আদায় করি না কেন তা নেহাৎ অকিঞ্চিতকরই হবে।

মূল আরবী বইটি আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি পুস্তক। এ পর্যন্ত অনুমোদিত ও অননুমোদিত মিলিয়ে সত্তরোর্দ্ধ সংস্করণ কেবল আরব বিশ্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং সবগুলোর একাধিক সংস্করণও বেরিয়েছে। বইটি সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কেবল আরব বিশ্বের নন বরং মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যিক, ইসলামের অমর শহীদ মিসরের সাইয়েদ কুতুব (র) এর ভূমিকা লিখেছেন। এমন একটি বই-এর তরজমা করার সৌভাগ্য জুটবে এমনটি ভাবতে পারাও অধমের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। অথচ সেই কল্পনাই আজ বাস্তবে রূপ নেয়ায় মনটি আমার আনন্দে আপ্লুত,- পরম প্রশান্তিতে মন-মস্তিষ্ক ভরপুর। কী ভাবে ও কোন ভাষায় আমি এর শুকরিয়া আদায় করতে পারি?

বইটির অনেক আগেই তরজমা হবার কথা ছিল। পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহল থেকে অধমের বরাবর অনেক বারই এজন্য তাকীদ এসেছিল। আমিও চাচ্ছিলাম আমার পরম শ্রদ্ধেয় শায়খ-এর এ বইটি, যে বইটি তাঁকে আরব বিশ্বে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি দিয়েছে, তা বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হোক। এসময় আমার পরম সুহৃদ বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ এবইটির তরজমার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র 'আরকানে আরবা'আ' তরজমা করে এক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেন। তদুপরি 'প্রাচ্যের উপহার' নামক পুস্তকের অন্তর্গত 'বাংলার উপহার' ও 'পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশে' নামক দু'টি অংশের

অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দেন। কাজেই তাঁর আগ্রহের কারণে আমি এর থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হই। তদুপরি সে সময় আমি 'নবীয়ে রহমত' নামক মুহতারাম শায়খ (র)-এর আরেকটি বই তরজমা করতে থাকায় এ বিষয়ে আর তেমন আগ্রহ দেখাইনি। তবে বরকত লাভের জন্য বই-এর প্রথম দু'টো অধ্যায় তরজমার ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা তাঁকে কয়েকবার জানাই। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বইটিই এককভাবে তরজমার আগ্রহ ব্যক্ত করায় আমি এর থেকে পুনরায় বিরত হই। কিন্তু তারপরও যখনই দেখা হয়েছে তিনি কাজ শুরু করেছেন কিনা কিংবা কাজ কতটুকু এগোল সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় তাকীদ দিয়েছি। কিন্তু এরপরও আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় আমি কি করব, আমাকে কী করা উচিত সে সম্পর্কে ভাবছিলাম। প্রধানত নিজের হাতে গড়া 'মাদরাসাতুল মদীনা' নিয়ে অত্যধিক ব্যস্ত সময় কাটাতে হওয়ায়, তদুপরি অতি জরুরী কিছু কাজ হাতে থাকায় এবং এসব কাজ করতে গিয়ে কোন কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি একাজের জন্য প্রয়োজনীয় অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। অথচ এ বই-এর প্রতি সুতীব্র আকর্ষণের দরুন এর ওপর তাঁর দাবি হাত ছাড়া করতেও তিনি রাজী হতে পারছিলেন না। এ রকম টানা পোড়েন অবস্থার মাঝে আরও কিছুদিন কেটে যায়।

ইতিমধ্যে 'নবীয়ে রহমত' প্রকাশিত হয়েছে। আমার হাতে তখন কোন কাজ নেই। আমি আবারও তাকীদ দিলাম। কিন্তু লাভ হলো না। অথচ আমি এর বেশি কিছু করতেও পারছিলাম না। না পারার পেছনে কারণ ছিল হযরত নদভী (র)-র প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত আকর্ষণ, সর্বোপরি জনাব হাফেজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ আমার একমাত্র পুত্রের অত্যন্ত শফীক উস্তাদ।

মুহতারাম শায়খ (র)-এর বরকতময় সান্নিধ্যে রমযান কাটাবার জন্য ১৯৯৮ সালে আমি ভারতের রায়বেরেলীতে যাই। ১লা শাওয়াল। ঈদুল ফিতরের বিকেল। মুহতারাম শায়খ (র)-কে ঘিরে আমরা বাংলাদেশী কাফেলার লোকেরা বসেছি। এ কাফেলায় আছেন মাওলানা আবদুর রায্‌যাক নদভী, মাওলানা যুলফিকার আলী নদভী, মাওলানা ওবায়দুল কাদের নদভীসহ আরও কয়েকজন যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হযরত শায়খ (র)-এর সঙ্গে আমরা কথা বলছি। এ সময় তিনি আমাকে লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত কি কি বই বাংলায় তরজমা হয়েছে জানতে চাইলেন। এক পর্যায়ে তিনি 'মা যা খাসিরা'ল আলামু বি-ইনহিতাতি'ল- মুসলিমীন' তরজমা হয়েছে কিনা জানতে চান। আমি মাথা নিচু করে মাওলানা আবদুর রায্‌যাকের দিকে চাইলাম, কি জবাব দেব এই আশায়।

তিনি গোটা ব্যাপারটা জানতেন। ইঙ্গিতে আমাকে তরজমার ব্যাপারে রাজী হবার জন্য বললেন। তার এই ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে আমি কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে দো'আ করার জন্য দরখাস্ত করলাম যাতে সফর থেকে দেশে ফিরে গিয়ে এর কাজ শুরু করতে পারি। এরপর হযরত 'বহুত আহম কিতাব, বহুত মুফীদ কিতাব, ইসকা তরজমা হোনা চাহিয়ে' বহুত বড়া খলা হায় (খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই, উপকারী বই, এর তরজমা হওয়া দরকার, বিরাট শূন্যতা রয়েছে) ইত্যাদি বলে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন। এরপর এ সম্পর্কে আরও কিছু দিক-নিদের্শনাও দিলেন। আর সেই উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনা অবশেষে আমাকে এই দুরূহ কাজে হাত দিতে কেবল অনুপ্রাণিতই করেনি–এর সমাপ্তিতেও প্রেরণা জুগিয়েছে।

বই-এর মূল লেখকের ভূমিকা তরজমা করেছেন স্নেহভাজন মাওলানা আবদুর রায্‌যাক নদভী এবং সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) লিখিত পুস্তক পরিচিতি সম্পর্কিত অংশটুকু তরজমা করেছেন আরেক স্নেহভাজন মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ইউসুফ নদভী। দীনি ভাই ছাড়াও তারা আমার পীর-ভাইও বটেন। শায়খ (র)-এর প্রতি পরম শ্রদ্ধা এবং অধমের প্রতি ভালবাসার তাকীদেই তারা এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ই এর জাযা দেবেন। সম্পাদনার দুরূহ দায়িত্বই কেবল নয়, উর্দু ও ফার্সী কবিতাংশের বাংলা তরজমা করে অধমকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন পরম শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও গবেষক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। এতে প্রশংসার কিছু থাকলে তা সম্পূর্ণটাই তাঁর আর ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়-দায়িত্ব আমি আমার ঘাড়ে তুলে নিচ্ছি। এরপর পরবর্তী সংস্করণে আল্লাহ্ পাক যদি সেই কাফ্‌ফারা আদায়ের সুযোগ দেন তবে সেটা হবে তাঁরই অপার মেহেরবানী।

পরিশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আমার এককালীন সহকর্মী পরম শ্রদ্ধেয় ভাই আজিজুল ইসলামকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি একটি প্রুফ দেখার পাশাপাশি বেশ কিছু ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দিয়েছেন। প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ায় মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুহাম্মদ আবদুর রউফ ভাইয়ের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রইলাম। এছাড়া মুদ্রণের ব্যাপারে দৌড়াদৌড়ির জন্য স্নেহধন্য জাকিরকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তরজমার ব্যাপারে তাকীদ দিয়ে এবং অগ্রগতির ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ-খবর

নিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন বন্ধুবর মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, মাওলানা সালমান, মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী প্রমুখ। অধিকন্তু আমার জীবন-সঙ্গিনী বেগম জেবুন্নেছাসহ আমার ছেলেমেয়েদের সকলের প্রতি একাজে– বিশেষ করে নির্ঘন্ট তৈরির কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও দোআ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

মুহতারাম শায়খ আল্লামা নদভী (র)-র যেই অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসা লাভের সৌভাগ্য জুটেছে তা অধমের জীবনকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেছে। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তবু এ মুহূর্তে কেবল একটি কথাই মনে হচ্ছে, যদি মুহতারাম শায়খ (র)-এর জীবদ্দশায় তাঁর হাতে অনূদিত এ বইটি তুলে দিতে পারতাম। মেহেরবান মালিক! তুমি আমার মুহতারাম শায়খ আল্লামা নদভী (র)-কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব কর এবং আমাদেরকেও তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে একটুখানি স্থান দিও। হে আল্লাহ! এ দোআ ও মুনাজাত তুমি কবুল কর।

আল্লাহ রাব্বু'ল– আলামীনের রেযামন্দী ও রসূল আকরাম (সা)-এর শাফাআত লাভ, অতঃপর মুহতারাম শায়খ (র)-এর দোআ প্রাপ্তি এবং বাংলার মুসলিম তরুণদের সুপ্ত দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলার সুতীব্র তাকীদ থেকেই একাজে হাত দিয়েছিলাম। এক্ষণে উল্লিখিত লক্ষ্য হাসিলে অধমের এ প্রয়াস যদি বিন্দুমাত্রও সফলতা লাভ করে এবং মুসলিম তরুণদের হৃদয়ে সামান্যতম দায়িত্ব অনুভূতিও সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রমকে তাঁর অপার মেহেরবানীতে কবুল করুন। আমীন!

আহকার
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
রহমতপুর, ঢাকা

৯ সফর, ১৪২৩ হিজরী
১০ বৈশাখ, ১৪০৯ বাং

একাদশতম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ! বিশ্বে মুসলমানদের উত্থান ও পতনের প্রভাব' শীর্ষক এ বইটির একাদশতম সংস্করণ প্রকাশিত হলো। উপর্যুপরি অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হবার ফলে বইটি জ্ঞানী-গুণী মহলে ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজে যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সে সম্পর্কে এই দীন লেখকের কোন পূর্ব ধারণা ছিল না।

বইটির ইংরেজী সংস্করণ 'Islam and the World' নামে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয় এবং পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক জেনে খুশি হবেন যে, এর প্রকাশক যখন বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সংস্থার এ বিষয়ক অভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের মতামত কামনা করেন তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. বাকিংহাম নিম্নোক্ত রূপ মত ব্যক্ত করেনঃ বইটি ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কেননা বর্তমান শতাব্দীতে মুসলিম পুনর্জাগরণের যেই প্রয়াস সর্বোত্তম উপায়ে হয়েছে এটি তার নমুনা ও ঐতিহাসিক দলীল। সংস্থার অপর উপদেষ্টা বিজ্ঞ ও খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মন্টগোমারী ওয়াট বইটি অধ্যয়নের পর তাঁর সুচিন্তিত অভিমতে প্রকাশের যোগ্য বলে রায় দেন।

ইরানের 'কুম' শহরে অবস্থিত বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'জলসাত ইলমী ইসলাম শেনাসী' এর ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেছে। বইটি গভীর আগ্রহে পঠিত হচ্ছে বলে আমরা জেনেছি। তুরস্কে ইতিমধ্যেই এর কয়েকটি তুর্কী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ও গভীর আগ্রহে পঠিত হচ্ছে। ফরাসী ভাষায়ও এটি অনুবাদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। লেখক এর অনুমোদন দিয়েছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার আরও কয়েকটি ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে।

বেশ কিছুদিন যাবত বইটি দুষ্প্রাপ্য হবার কারণে ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি, পূর্বের মতই বইটি আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হবে।

৭ই মুহার্রাম, ১৪১৩ হিজরী
৯ই জুলাই, ১৯৯২ইং

আবুল হাসান আলী নদভী
নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ।

পূর্বকথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় প্রশংসা এবং আমাদের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও পরবর্তী বংশধর, এবং তাঁর সকল সাহাবীর ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

বক্ষ্যমান বইটির ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা একটি প্রবন্ধের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। প্রথম দিকে মনে করেছিলাম যে, মুসলমানদের অধঃপতন এবং দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে সরে যাবার কারণে মানব জাতির কী ক্ষতি হয়েছে তা মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করব এবং দেখাতে চেষ্টা করব পৃথিবীর মানচিত্রে ও তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর মাঝে তাদের অবস্থানগত মর্যাদা কী। এর পেছনে এর বেশি আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না যে, মুসলমানদের মনে এই ক্ষমাহীন অপরাধ ও গাফিলতি সম্পর্কে যেন অনুশোচনা জাগে যা তারা মানব জাতির ক্ষেত্রে করেছে। অতঃপর এর প্রতিকার ও সংশোধনকল্পে তারা যেন সযত্ন প্রয়াসী হয়, তাদের মধ্যে যেন এর প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সেই সাথে দুনিয়াবাসী তাদের সেই দুর্ভাগ্য সম্পর্কেও যেন অবহিত হতে পারে, যেই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন মুসলিম নেতৃত্ব থেকে মাহরূম হবার কারণে তাদেরকে হতে হয়েছে। তারা যেন অনুভব করতে পারে যে, এই অবস্থার মধ্যে বড় রকমের কোন কল্যাণকর পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বস্তুপূজারী ও খোদাভীরুহীন মানুষের হাত থেকে বের করে সেই সব আল্লাহভীরু মানুষের হাতে তুলে দেয়া হবে যারা আল্লাহর পয়গম্বর ও নবী-রসূলদের ওপর ঈমান রাখে, তাঁদের দেয়া হেদায়েত (পথ-নির্দেশনা) ও শিক্ষামালা থেকে আলো ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে এবং যাদের কাছে আখেরী নবীর দীন ও শরীয়ত এবং দীন ও দুনিয়ার পথ-প্রদর্শন ও নেতৃত্ব দানের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বর্তমান।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সাধারণ মানব ইতিহাস ছাড়াও ইসলামী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব কেমন জাহিলী পরিবেশে হয়েছিল, মানবতা তখন অধঃপতনের কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল? তাঁর দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ কেমনতরো উম্মাহ সৃষ্টি করেছিল। সেই উম্মাহ্র বোধ-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, শিক্ষা ও জীবন-চরিত কেমন পূত-পবিত্র ছিল? তাঁরা কিভাবে পৃথিবীর ক্ষমতার চাবিকাঠি ও নেতৃত্বের বাগডোর নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল? তাঁদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন-যিন্দেগী,

মানুষের রুচি-প্রকৃতি ও প্রবণতার মাঝে কী প্রভাব ফেলেছিল, কী ভাবে তাঁরা পৃথিবীর গতিধারা জগত জোড়া আল্লাহ্‌ বিস্মৃতি ও সামগ্রিক জাহেলিয়াত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলামের দিকে মোড় নিল এরপর কেমন করে সেই উম্মাহ্‌র মধ্যে অধঃপতন দেখা দিল ও তাকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন থেকে সরে যেতে হলো এবং কিভাবে এই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দুর্বল ও অলস, আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত একটি জাতির হাত থেকে বেরিয়ে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ, শক্তিশালী ও বস্তুপূজারী য়ূরোপের হাতে গিয়ে পড়ল, এরপর স্বয়ং য়ূরোপেই এই বস্তুপূজা ও ধর্মদ্রোহিতা কিভাবে দেখা দিল ও তা বিকশিত হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মেযাজ কি? এর মূল প্রকৃতি কি কি উপাদানে তৈরি, য়ূরোপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পৃথিবীর ওপর কী প্রভাব ফেলে এবং সমাজ জীবনকে তা কিভাবে প্রভাবিত করে, দুনিয়ার গতিধারা কোন দিকে এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী এবং সে কিভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে, দিকভ্রান্ত মানবতাকে সন্ধান দিতে পারে তার সঠিক পথ ও প্রকৃত গন্তব্যস্থলের।

লেখার কালেই লেখকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিষয়টি একটি প্রবন্ধের নয় বরং একটি বিরাট বিস্তৃত গ্রন্থের এবং এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনা সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। স্বয়ং মুসলমানদের ধারণাই এ ব্যাপারে পরিষ্কার নয়। তারা নিজেদের জীবনের সঙ্গেই কোন সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা অনুভব করে না এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের কোন যিম্মাদারী আছে বলেই মনে করে না। বহুলোক এমন আছেন যারা মুসলমানদের অধঃপতনকে একটি জাতীয় দুর্ঘটনা ও স্থানীয় ঘটনার বেশি মনে করেন না এবং এ ব্যাপারে তাদের আদৌ কোন অনুভূতিই নেই যে, এটা কত বড় সর্বব্যাপী দুর্ঘটনা ছিল এবং মানবতার জন্য কত বড় দুর্ভাগ্য।

আসল কথা হলো, এই বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে ও উপেক্ষা করে আমরা যেমন ইসলামের ইতিহাস বুঝতে পারব না, তেমনি বুঝতে পারব না মানব জাতির ইতিহাসকেও। এই যুগকে যথাযথ ও সন্দেহাতীতভাবে নিরুপণও করতে পারব না, যে যুগ এই মুহূর্তে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছে। তেমনি এই সর্বগ্রাসী বিপ্লবের সঠিক কার্যকারণও আমরা নির্ধারণ করতে পারব না যা দুনিয়ার ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে বিপ্লব ইসলামী বিপ্লবের পর সর্ববৃহৎ বিপ্লব। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, প্রথম বিপ্লব ছিল মন্দ থেকে ভালোর দিকে, অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে, অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকে। পক্ষান্তরে এই বিপ্লব ভাল থেকে মন্দের দিকে, কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের দিকে। প্রথম বিপ্লব

ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও ইসলামী দাওয়াতে উত্থানের ফসল আর দ্বিতীয় বিপ্লব উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার পতন এবং ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে গাফিলতি ও শৈথিল্য প্রদর্শনের পরিণতি। আজ মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের ওপর আস্থা, ইসলামী রূহ তথা ইসলামী প্রাণ-সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তনের আবেগ ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, তাদেরকে তাদের হৃত মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পরিষ্কারভাবে বলা যে, তারা দুনিয়াকে নতুন করে গড়বার গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কর্মে অত্যন্ত কার্যকর ও সক্রিয় উপাদান (Factor) হিসাবে ভূমিকা পালনকারী শক্তি, চলমান কোন মেশিনের যন্ত্র কিংবা কোন নাট্যমঞ্চের কুশলী অভিনেতা (Actor) নন।

যেই দেশ ও পরিবেশে লেখকের জন্ম, যেখানে লেখক লালিত-পালিত ও বর্ধিত এবং যেখানে এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার খেয়াল জেগেছিল তার দাবি ছিল, এই গ্রন্থ সে দেশের ভাষায় লিখিত হবে (অর্থাৎ উর্দূতে)। কিন্তু এক বিশেষ ধারণার বশে উর্দূর পরিবর্তে আমাকে আরবী ভাষায় লিখতে হয়েছে, উর্দূর বিপরীতে আরবীকে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে।

আরবী ভাষা নির্বাচন ও অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ লেখকের এই অনুভূতি যে, আরব দেশগুলো আজ হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত এবং আত্মবিস্মৃতির সব চাইতে বেশি শিকার। দুনিয়া যদিও এককালে তাদের থেকেই নতুন জীবন ও নবতর ঈমান লাভ করেছিল, অথচ আজ সেখানকার পরিবেশই সবচেয়ে বেশি নির্বাক নিস্তব্ধ এবং তাদেরই সমুদ্র সর্বাধিক শান্ত ও তরঙ্গহীন। প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল আজ থেকে অনেক বছর আগে এসব দেশের দিকে তাকিয়ে যা বলেছিলেন তা মোটেই অযথা বলেন নি;

শুনি না আমি সেই আযান মিসর ও ফিলিস্তীনে,
পাহাড় ও পর্বতকে দিয়েছিল যা জীবনের পয়গাম।
যে সিজদায় প্রকম্পিত হতো ধরণীর অন্তরাত্মা,
মিম্বর ও মেহরাব আজ অধীর প্রতীক্ষায় তার।

য়ূরোপের নৈকট্য, বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা এবং সেসব দামাল সন্তানদের সংখ্যাল্পতার দরুন, সৌভাগ্যবশত ভারতবর্ষের মাটিতে যাঁদের অব্যাহতভাবে জন্ম হয়েছে, আরবের পবিত্র ভূখণ্ড যাঁদের অস্তিত্ব থেকে দীর্ঘকাল যাবত মাহরূম ছিল, আরব বিশ্বকে য়ূরোপের চাতুর্য ও কুটকৌশলের সহজ শিকারে পরিণত করে। শায়খ হাসান আল-বান্দা মরহুম ও তাঁর আন্দোলন এবং আল-ইখওয়ানুল মুসলেমূন (মুসলিম ব্রাদারহুড)-এর আগে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে কোন শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন কিংবা কোনরূপ কর্মতৎপরতা ছিল না। আরব বিশ্বের

কোথাও অস্থিরতা ও অটুট মনোবলের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতো না। সেখানকার লোকেরা হয়তো যুগের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছিল কিংবা হতাশ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়েছিল অথবা স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। আরব বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী এবং তার গৌরবময় অতীত ও দুঃখজনক বর্তমানের মাঝে তুলনাকারী অত্যন্ত আক্ষেপ ও ব্যথা নিয়ে বলছিলেন ঃ

হেজাযের এ কাফেলায় একজন হুসায়নও নেই।

যদিও দিজলা ও ফোরাত আজও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ।

এই কষ্টকর ও বেদনাময় অনুভূতিই কলমের গতি উর্দূ থেকে আরবীর দিকে ফিরিয়ে দেয়।

আরবরা তাদের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই আজ আন্তর্জাতিক ও বিশ্বনেতৃত্ব গ্রহণের অধিকারী এবং গোটা সভ্য জগতের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মাঝেই তাদের অবস্থান। অবস্থান তাদের দূর প্রাচ্যের মধ্যভাগে। বিশ্বব্যাপী নতুন বিপ্লব ও ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য আরব জাহান ও মধ্যপ্রাচ্যের চাইতে অধিক উপযোগী ভূখণ্ড আর কোনটিই হতে পারে না। এসব কারণেই একজন হিন্দী বংশোদ্ভূত হয়েও লেখক আরবী ভাষাকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং এ গ্রন্থ সর্বপ্রথম আরবীতেই লেখা হয় এবং ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين নাম রাখা হয়।

এ সময়েই (১৯৪৭ সালে) হেজাযের প্রথম সফরের সুযোগ ঘটে। সেখানে প্রথম বারের মত লেখক আরব দেশ ও সেদেশের বাসিন্দাদের খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান যাদের জন্য এ বই লেখা হয়েছিল। হেজায অবস্থান ও আরব জাহানের লোকদের সঙ্গে পরিচয় লেখকের ধারণাকে আরও শক্তি জোগায় এবং এ বইয়ের যথা সম্ভব সত্বর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে আরও তীব্রতর করে তোলে। মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থানকালে লেখক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আবশ্যকতা আরও তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং জাহিলী যুগের সামগ্রিক চিত্র আরও স্পষ্টতর করে অংকন ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা দরকার বোধ করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সময় দুনিয়ার অবস্থা কি ছিল এবং কোন ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। ইসলামী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার বিস্ময়কর ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যাবে না যতক্ষণ না জাহিলিয়াত যুগের সমগ্র পরিবেশ ও তার চিত্র সামনে আসে। এ জন্যই প্রয়োজন মনে করেছি জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ এ্যালবাম পেশ করার। এসময় দেখতে পেলাম জাহিলী যুগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপকরণ খুবই দুষ্প্রাপ্য। কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলো বিভিন্ন পুস্তকের হাজারো পৃষ্ঠার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে সব তথ্য-উপাত্ত একত্র করা এবং ঐ সব বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত অংশের সাহায্যে জাহেলিয়াতের পরিপূর্ণ এ্যালবাম তৈরি করা যাতে সে যুগের সমগ্র জীবনে সামনে এসে যায়– সীরাতুন নবীর একটি বিরাট বড় খেদমত। মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থানকালে লেখক প্রাচীন ও আধুনিক কালের লিখিত গ্রন্থাবলীর এমন এক ভাণ্ডার পেয়ে যান এই এ্যালবাম তৈরিতে যা বিরাট সাহায্য করেছে। হিন্দুস্তানেও অধ্যয়ন ও গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকে এবং এই অধ্যায় পূর্ণতা পায় ও পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে পুস্তকটি আরও সমৃদ্ধ হয়। এরই সাথে সাথে এই ধারণাও সৃষ্টি হয় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের আর্বিভাবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং ইসলামী দাওয়াতের অনান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি। সেই সাথে এই দাওয়াতের মেযাজ ও এর কর্মপন্থা কি, আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম স্ব-স্ব যুগের বিগড়ে যাওয়া পৃথিবীর কিভাবে সংস্কার ও সংশোধন করতেন, তাঁদের দাওয়াত ও চেষ্টা-সাধনার ধরন অপরাপর সংস্কারক ও নেতৃবৃন্দের থেকে কতটা ভিন্ন, তাঁদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়াই বা কি হতো কিংবা কিভাবেই বা লোকে একে অভ্যর্থনা জানাত, জাহেলিয়াত কিভাবে তার মুকাবিলায় এসে দাঁড়াত এবং এর মুকাবিলায় কি কি ও কোন্ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত, আর আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম তাঁদের অনুসারীদের কি ভাবে প্রশিক্ষণ দান করতেন, তাদেরকে গড়ে তুলতেন, এরপর তাঁদের দাওয়াত কিভাবে বিজয় লাভ করত এবং কিভাবেই-বা এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি জাহির হতো তাও খোলাখুলি তুলে ধরি। এটা এ বইয়ের একটি অপরিহার্য অধ্যায় যা ছাড়া এ বই অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

লেখক চাচ্ছিলেন, বইটি যেহেতু আরবী ভাষায় লেখা বিধায় এটি মিসরের কোন অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হোক এবং যথাযোগ্য পরিচিতি পাক যাতে করে যেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে নিয়ে এটি লেখা হয়েছিল তা সফল হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর لجنة التأليف والترجمة والنشر নামক প্রতিষ্ঠানকে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি মিসরের একটি মর্যাদাবান ও অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে খ্যাত।

বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ড. আহমদ-আমীন, সাবেক প্রধান, ভাষা বিভাগ, মিসর 'ভার্সিটি-কে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। ড. আহমদ আমীন ইতোমধ্যেই দুহা'ল ইসলাম ও ফজরুল ইসলাম' নামক দু'টো বই লিখে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি ও সুস্থ চিন্তা-চেতনা লেখককে সে সময় বেশ প্রভাবিতও করেছিল। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ড. আহমদ আমীনের খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এ সম্পর্কে একটি রিভিউ রিপোর্ট পেশের জন্যও অনুরোধ জানানো হয়। তিনি প্রকাশনা কমিটি বরাবর তাঁর পেশকৃত রিভিউ রিপোর্টে পুস্তকটি প্রকাশের পক্ষে জোরালো সুপারিশ করেন এবং কৃত অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি ভূমিকাও লেখেন।

কিন্তু বইটি প্রকাশের পর দেখা গেল, ভূমিকা লেখক হিসেবে ড. আহমদ আমীনকে নির্বাচন করে লেখক ভুল করেছেন। কেননা কোন বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য লেখকের সুস্থ চিন্তা-চেতনা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন ভূমিকা লেখক মূল বইয়ের পেশকৃত বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর প্রতি সহানুভূতিশীল ও একমত হবেন এবং লেখকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উৎসাহী সমর্থক হবেন, লেখকের বক্তব্যের ব্যাপারে পূর্ণ প্রত্যয়ী ও এর সাফল্যের ব্যাপারে আন্তরিকভাবেই আকাঙ্ক্ষী হবেন। ভূমিকা লেখকের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কমতি ছিল। তিনি ছিলেন কেবলই একজন চিন্তাশীল লেখক এবং একজন সফল ঐতিহাসিক। ইসলামের পুনর্জাগরণও যে সম্ভব এবং সে যে পুনরায় সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম সে ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী নন। একেও তিনি একটি তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক বিষয়ের মতই ভাবতে পারেন, কিন্তু এর প্রতি নিজের অন্তরের গভীরে বিশেষ কোন আবেগ ও আশা-ভরসা পোষণ করেন না। মূলত গ্রন্থের মূল স্পিরিটের সঙ্গে ভূমিকা লেখকের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না।

ফল হলো এই, তাঁর লিখিত ভূমিকা হলো নিষ্প্রাণ, প্রভাবশূন্য ও আবেদনহীন দায়সারা গোছের। মিসর, ফিলিস্তীন ও হেজায ভূমিতে সর্বত্রই এটা অনুভূত হয়েছে যে, ভূমিকা বইয়ের মূল্য ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবার পরিবর্তে তার মূল স্পিরিটকেই আহত করেছে এবং বইটাকে হাল্কা করে দিয়েছে। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বইটি আলোচ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হওয়ায় সব দিক থেকেই উপকার হয়েছে। কেননা, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বইটি সেসব মহলে পৌছে গেছে যেখানে নির্ভেজাল ধর্মীয় বই ও ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা খুব সহজে গৃহীত হয় না।

১৯৫১ সনে যখন মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণের সুযোগ হলো-তখন এটা দেখে বড় আশ্চর্য লাগল এবং আনন্দও অনুভব করলাম যে, বইটি সে সব দেশে বড় আগ্রহের সাথে পঠিত হচ্ছে এবং অত্যন্ত উষ্ণ আবেগের সাথে বইটিকে স্বাগতম জানানো হয়েছে যা প্রকাশ পাবার দু-তিন মাসের মধ্যেই সমগ্র আরব বিশ্বে পৌছে গিয়েছিল। ইসলামী দলগুলো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইসলামী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিজেদের পক্ষ থেকে এ বই-এর প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রশিক্ষণী সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্টাডি সার্কেল ও ট্রেনিং প্রশিক্ষণী গোষ্ঠী থেকে নিয়ে জেল খানা পর্যন্ত এর প্রচার ও প্রসারের কাজ করা হয়। আদালতের বিতর্কে ও পার্লামেন্টের বক্তৃতায়ও এ বই থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক ও প্রাচীনপন্থী উভয় শ্রেণীই একে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে। বিষয়টি যেমন গ্রন্থকারের জন্য মর্যাদা ও কৃতজ্ঞতার ব্যাপার তেমনি আরবদের প্রশস্ত অন্তর, সৎ সাহস ও সত্য প্রেমের সুস্পষ্ট প্রমাণও বটে। বইটিকে তারা যেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এর দূরপ্রান্তের একজন লেখককে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন ও সাহস যুগিয়েছেন স্বদেশেও যা আশা করা যেত না।

মিসরে অবস্থানের সময়ই বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ এসে যায়। এ সময় গ্রন্থকারের একনিষ্ঠ বন্ধু ও গ্রন্থের বিশেষ একজন ভক্ত মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসা, সাবেক উস্তাদ, জামিউল আযহার এবং প্রফেসর, ইসলামিক ল,কায়রো ইউনির্ভারসিটি) স্বীয় কমিটি 'জামা আতুল আযহার লিন্নাশরি ওয়া তা'লীফ- এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। লেখকের ইঙ্গিতে তারা আহমাদ আমীনের কাছ থেকে এর অনুমতিও নিয়ে নেন। ফলে পূর্ব ভুলের প্রতিকারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা গ্রন্থের ভূমিকা লেখানোর সুযোগ আসে যিনি গ্রন্থের লক্ষ্য ও স্পিরিটের সাথে পরিপূর্ণ প্রত্যয় রাখেন এবং লক্ষ্যের দিকে শক্তিশালী আহ্বানকারী। এ কাজের সবচে' যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সায়্যিদ কুতুব (র)। কারণ সায়্যিদ কুতুব (র) ছিলেন আধুনিক মিসরে ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী পতাকাবাহী। তাঁর কলম বিগত কয়েক বছর যাবত যুব সমাজের মধ্যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টির কাজে উৎসর্গীত ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, বিশ্বকে অধ্যয়ন, আধুনিক সাহিত্যের শক্তিশালী কলম ও রীতিমত একজন নিষ্ঠাবান দাঈর আবেগ ও নিষ্ঠা এবং একজন নুতন মুসলমানের জোশ-জযবার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর অবস্থানগত কারণে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরও একজন নওমুসলিমই ছিলেন। পরিবেশ তাঁকে

ইসলাম থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু আল-কুরআনের অধ্যয়ন ও গবেষণা, পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতা ও দেওলিয়াপনা তাঁকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনে। তাই তিনি নতুন আবেগ-উচ্ছাস, নতুন দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দারুল উলুম মিসর (বর্তমান কায়রো ভার্সিটির অংশ)-এর স্কলার। সাহিত্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। তিনি খুব দ্রুত সুধী সমাজে স্বীয় অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁর النقل الادبى (সাহিত্য সমালোচনা) التصوير الفنى فى القر ان (আল-কুরআনের শিল্প-সৌন্দর্য্য) مشاهد القيامةفى القران الكريم (আল-কুরআনে মহা প্রলয়ের দৃশ্য) যা এ যুগের স্মরণীয় ও সাহিত্য সমাজে বরণীয় সফল গ্রন্থসমূহের অন্যতম। দীর্ঘ দিন যাবৎ শিক্ষা বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য তাঁকে বেশ কিছু কাল আমেরিকাতেও অবস্থান করতে হয়। অবস্থানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধকার দিকগুলো তাঁর সামনে দিবালোকের মত ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও এর জীবন দর্শনের ব্যর্থতার করুণ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ লাভ করেন। এতে তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায় ও সুদৃঢ় হয়। তাঁর মাঝে ইসলামী দাওয়াতের আবেগ ও উচ্ছাস আরও বর্ধিত হয়। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর তিনি ইসলামের আবেগ-উদ্বেলিত দাঈ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচক্ষণ সমালোচকে পরিণত হন। সর্বদা আধুনিক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজকে ব্যস্ত রাখেন। তাঁর চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ইসলামকে সমগ্র মানবতার জন্য একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন পয়গাম মানেন, যা ছাড়া পৃথিবীতে মুক্তি ও শান্তি আসতে পারে না। তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি অপারগতা ও আত্মরক্ষার পক্ষে নন বরং তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে কঠোর আঘাত হানেন এবং প্রতিপক্ষকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করেন। তিনি ইসলামের ভেতর কোন দূর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা অনুভব করেন না। তিনি ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন জীবন-বিধান হিসেবে পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে উপস্থাপন করেন। তাই তাঁর লেখা পাঠকদের মাঝে ইসলামের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা, প্রত্যয় ও নবজীবন দান করে এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সমাজ ব্যবস্থার জৌলুসকে উপেক্ষা করার শক্তি জোগায়। যুব সমাজ তাঁর গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধমালা পাঠে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাঁর গ্রন্থ العدالةالاجتماعيةفي الاسلام (ইসলামের সামাজিক সুবিচার) (বাংলায় অনূদিত) (যদিও তাঁর কোন কোন বক্তব্যের সাথে মতপার্থক্য আছে) এ ধরনের প্রচেষ্টার সফল উদাহরণ এবং আধুনিক ইসলামী আরবী সাহিত্যের মাঝে বিশিষ্ট মর্যাদার দাবিদার।

জনাব সায়্যিদ কুতুব বইটি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে পাঠ করেন। তাঁর সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় বইয়ের সারসংক্ষেপ পেশ ও তার ওপর আলোচনা-পর্যালোচনাও হতো যাতে লেখকেরও অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। ভূমিকা লেখার গোযারিশ করা হলে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন এবং এমন অপূর্ব সুন্দর ও পাণ্ডিত্যপূণ ভূমিকা লিখেন যার ভেতর তিনি গোটা বই-এর নির্যাসকে একত্র করে ফেলেন। এ ভূমিকা যা বর্তমানে বই-এর জন্য শোভা ও সৌন্দর্য, বই-এ এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করে যা গোটা বই-এর সুন্দর সারসংক্ষেপ। সায়্যিদ কুতুবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও মরহুম ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফ মুসাও মেহেরবানী করে একটি ভূমিকা লেখেন যার ভেতর তিনি বই সম্পর্কে তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণা ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া লেখকের অকৃত্রিম বন্ধু শায়খ আহমদ শেরবাসী (উস্তাদ, জামিউল আযহার) লেখকের অজান্তেই নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে গ্রন্থকারের পরিচয় ও সংক্ষেপে লেখকের জীবন-বৃত্তান্ত লেখেন। এ দু'টো ভূমিকা অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

১৯৪৬ সনে একথা ভেবে যে- না জানি কবে আসল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, লেখক গ্রন্থখানিকে উর্দূ ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ অনুবাদ গ্রন্থ 'মুসলমানূঁকে তানাযযুল ছে দুনিয়া কো কিয়া নুকসান পহুঁচা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে বইটির অংগ-সজ্জা, কাগজ ও ছাপা ইত্যাদি বইয়ের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। বইটির প্রাথমিক দু'টি অধ্যায় [মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের আগে ও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পরে] যা ৪৭-এর পর সংযোজন করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংযোজন যা মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত ছিল না। এ পর্যন্ত মিসর থেকে গ্রন্থের দু'টি সংস্করণ বের হয়ে গিয়েছে এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পথে এবং সংযোজনের ফলে বই-এর কলেবর দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর উর্দূতে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা জন্ম নেয়। এ সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক নানাবিধ কারণে এর অনুবাদ করার আমার ফুরসত হচ্ছিলো না। তাই এসবের অনুবাদের দায়িত্ব আমার প্রিয় সহকর্মীদের ওপর অর্পণ করি। আল্লাহ্র শোকর যে তারা সে খেদমত অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। এসব খেদমতের মাঝে সবচে বড় অংশ আবদুল্লাহ ফুলওয়ারী নদভী (ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, নদওয়াতুল উলামা) এবং মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে নদভী, শিক্ষক (ভাষা ও সাহিত্য, নদওয়াতুল উলামা) কে অর্পণ করা হয়। কিছু অংশ স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আল-হাসানীর কলমেও আনজাম পেয়েছে। আমি উক্ত

প্রিয়ভাজনদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাদের জন্য দ'আ করছি। কারণ তাদের প্রচেষ্টাই বইটি আলোর মুখ দেখার উপযুক্ত হয়েছে। এখন বইটি "ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানূঁকে উরূজ ও যাওয়াল কা আছর" (বিশ্বে মুসলমানদের উত্থান পতনের প্রভাব) নামে উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থকার বই-এর ক্ষেত্রে কোন নতুন আবিষ্কার, বিশেষ গবেষণা ও ইজতিহাদের দাবি করেন না আর না নিজের ব্যাপারে কোন অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। এ বইটি একটি নিষ্ঠাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা মাত্র এবং একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ জবাব। হতে পারে এ প্রশ্ন অনেকের মস্তিষ্কেই এসেছে এবং বিভিন্নভাবে তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। লেখক শুধু এতটুকু করেছেন যে, উক্ত প্রশ্নটি সকলের সামনে উত্থাপন করেছেন এবং একে একটি স্বতন্ত্র বিষয় বানিয়ে এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ একত্র করে দিয়েছেন। এতে যদি কোন অন্তরে সামান্যতম অনুভূতি ও চেতনা সৃষ্টি হয়, কোন হৃদয়ে নুতন ব্যথা ও বেদনার উদ্রেক করে, তবে গ্রন্থকার তাঁর প্রচেষ্টায় সফল। প্রত্যেক কল্যাণময় বিপ্লব ও নতুন সমাজ গড়ার জন্য অন্তরকে জাগ্রত করা এবং মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই সঠিক লক্ষ্যে ইতিহাসকে বিন্যাস এবং এমন লেখনী ও রচনাবলীর প্রয়োজন যা যুক্তি ও প্রমাণ সর্বদিক থেকে মন-মস্তিষ্ক, অন্তর ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম। অপর দিকে তা পাঠকের অন্তরে প্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম দেবে এবং কর্মের আবেগ সৃষ্টি করবে। অতির ন ও বিনয় উভয় থেকে মুক্ত হয়ে এ কথা বলার সাহস করা যায় যে, বইটি স্বীয় বিষয় ও উপাদানের দিক থেকে এ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং এ গ্রন্থ থেকে দল-মত নির্বিশেষে সকল চিন্তার অধিকারী মুসলমান উপকৃত হতে পারেন।

وماتوفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب

১৫ রবিউছ-ছানী, ১৩৭৩ হি. আবুল হাসান আলী নদভী

بسم الله الرحمن الرحيم

মিসরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইসলামী চিন্তাবিদ অমর শহীদ সাইয়েদ কুতুব লিখিত ভূমিকা

আজ এমন একজন ব্যক্তির ভীষণ প্রয়োজন, যিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র সেই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবেন, যা তাদেরকে উজ্জীবিত চেতনায় শুধু সামনে চলার পথ-নির্দেশ করবে।

যিনি তাদেরকে বলবেন, 'তোমাদের একটি গর্বিত অতীত ছিল।' বলবেন, 'তোমাদের সামনে স্বপ্নভরা, আশাভরা একটি ভবিষ্যতও অপেক্ষা করছে।'

যিনি তাদেরকে সাবধান করে বলবেন– স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে তাদের সীমাহীন অজ্ঞতার কথা, হতাশাব্যঞ্জক গাফিলতির কথা। যিনি তাদের চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার করে বলবেন– এই দীন কোন 'উত্তরাধিকার' নয় বরং তা অর্জন করতে হয়। হাসিল করতে হয় শাণিত বিশ্বাস দিয়ে, জাগ্রত চেতনা দিয়ে।

আমি আনন্দিত। আমি পুলকিত। আমি আমার প্রতীক্ষিত সেই মহান ব্যক্তির দেখা পেয়েছি। তিনি হলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম 'রাহনুমা' ও মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। তাঁর অমর রচনা ماذاخسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?)-র মাধ্যমে তিনি অবিকল সেই কথাগুলোই মুসলিম উম্মাহ্‌কে বলেছেন যা একটু আগে আমি উল্লেখ করলাম। সত্যি বলতে কি, এই বিষয়ের ওপর আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে 'আগে-পরে' যত বই পড়েছি, নিঃসন্দেহে এ বই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

ইসলামের আকীদা কোন ঠুনকো আকীদা নয়। এই আকীদা উন্নতি ও চির উৎকর্ষের আকীদা।

এই দীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা মুমিনের হৃদয়-মনে অহংকার নয়– সম্মান ও মর্যাদাবোধের সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে আরো এই চেতনা যে, অন্য কিছুতে নয় একমাত্র ইসলামী চেতনাবোধ ও বিশ্বাসের ভিতর দাঁড়িয়েই তাদেরকে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। শান্তির ঠিকানা খুঁজতে হবে। তাদের ওপর রয়েছে গোটা বিশ্বের মানুষকে মুক্তির পথের ঠিকানা ও সন্ধান বাৎলে দেওয়ার দায়িত্ব। তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে উদ্ধার করে আলোকময় পৃথিবীর পথ দেখানোর দায়িত্ব, যে আলো এসেছে সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

" তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবতার কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে আর অকল্যাণ থেকে দূরে রাখবে আর ঈমান রাখবে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর।"

وكذالك جعلنا كم امة وسطالتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

"এই ভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হতে পার মানবজাতির জন্যে এবং রাসূল সাক্ষীস্বরূপ হবেন তোমাদের জন্যে।"

হাঁ, এই গ্রন্থে পাঠকের উদ্দেশ্যে সে সব কথাই তিনি বলেছেন। পাঠকের হৃদয়-মনে তা প্রোথিত করার হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা বেছে নিয়েছেন। এই গ্রন্থের গতিময়, প্রাণময় ও আবেগময় ভাষা ও উপস্থাপনায় পাঠকের মন আলোড়িত হয় ঠিকই কিন্তু বল্গাহারা হয় না। কোন অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িকতাও এখানে পাঠকের মনকে কলুষিত করে না বরং তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও আবেদনকে অত্যন্ত বর্ণিল ভংগীতে চমৎকার উপস্থাপনায় ও অত্যন্ত হৃদয়-নন্দিত করে পাঠকের আবেগ-অনুভূতি ও সেই বিচার-বুদ্ধির কাছে পরিবেশন করা হয়েছে। কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন প্রচ্ছন্নতা নেই, নেই কথায় কথায় কোন দ্বন্দ্বও। তাই কোন চাপাচাপি ছাড়াই অথচ ঠিক লেখকের ইচ্ছে মতই পাঠককে সিদ্ধান্ত নিতে একটুও বেগ পেতে হয় না। এটাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইসলামপূর্ব যুগে এই পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল, তিনি তাঁরও একটি চিত্র এঁকেছেন। সুসংহত চিত্র। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। কোথাও লুকোচুরি নেই। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সব দিকের চিত্রই রয়েছে এতে। হিন্দুস্তান থেকে চীন, চীন থেকে রোম ও রোম থেকে পারস্যসহ মোটামুটি সমগ্র দুনিয়ার সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সে চিত্র।

এই চিত্রে উন্মোচন করা হয়েছে য়াহূদী ও খ্রিস্ট ধর্মের স্বরূপ। যদিও তারা আসমানী ধর্মের অনুসরণের দাবিদার। এই চিত্রে ছিল প্রতিমাপূজারী হিন্দু ও বৌদ্ধদের কথাও। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এই চিত্রে তাদেরও একটি পরিপূর্ণ অবস্থা বিবৃত হয়েছে। আর মূল গ্রন্থের সূচনা এখান থেকেই।

এই চিত্রাংকন এক সুসংহত চিত্রাংকন। লেখক এখানে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। কোন গোঁড়ামী ও জিদকে কেন্দ্র করেও তাঁর লেখনী ও আলোচনা আবর্তিত হয়নি। তিনি বরং সকল প্রকার গণ্ডীমুক্ত হয়ে নতুন-পুরনোর সমন্বয় ঘটিয়ে পূর্বযুগ এবং বর্তমান যুগের অনেক গবেষক ও ঐতিহাসিকের মতামতও অত্যন্ত ইনসাফের সাথে উল্লেখ করেছেন। অথচ এদের অনেকেই ছিলেন ইসলাম বিদ্বেষী। ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করার অভ্যাস মিশে ছিল এদের কারো কারো অস্থি-মজ্জায়।

তিনি এমন এক দুনিয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন যখন পৃথিবীতে ছেয়ে গিয়েছিল জাহেলিয়াতের অন্ধকার। মানুষের বিবেক যখন সত্যের পক্ষে সাড়া দিত না।

মানুষের মন তখন নিষ্ঠুরতায় কেঁপে উঠত না। নির্বাসিত নীতি ও নৈতিকতা নীরবে শুধু কাঁদত। জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহতায় বারবার দুলে উঠত বনী আদমের এই আবাস। নিরন্তর ভেসে আসত এখানে-ওখানে নির্যাতিত মানবতার বুকফাঁটা আর্তনাদ। আসমানী ধর্ম তখনও ছিল কিন্তু ছিল বিকৃত ও প্রভাবহীন। তাতে ছিল না আত্মার কোন খোরাক, জীবনের কোন বার্তা। বিশেষত খ্রিষ্ট ধর্ম।

.... এরপর লেখক ইসলামী যুগের চিত্রাংকন শুরু করেছেন। জাহেলিয়াতের তিমির ভেদ করে হেসে উঠল পৃথিবী। এই চিত্রের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পাঠক যতই ওপরে উঠবেন, ততই দেখবেন ইসলামের আলো-রশ্মি। এখানে চিত্রিত হয়েছে মানবাত্মার মহামুক্তির কথা। এ মুক্তি সংশয় ও কুসংস্কার থেকে। গোলামী ও দাসত্ব থেকে। নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বস থেকে।

এখানে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত হয়েছে ইসলামী অনুশাসনের ছায়াতলে ইসলামের অনুপম আদর্শের পরশে। এখানে কোথাও নেই দুর্বলের ওপর সবলের সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি। এখানে কোথাও নেই গোত্রে- গোত্রে ও জাতিতে-জাতিতে হানাহানি ও মারামারি।

এই চিত্রে আরো ফুটে উঠেছে জাহেলিয়াতের চির অমানিশা থেকে মুক্ত হয়ে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার বর্ণিল ছবি। একের পর এক। যার ভিত্তি সততা, পবিত্রতা, আল্লাহ ভীতি ও আমানতদারী।

--- যার ভিত্তি আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং নিঃশর্ত আনুগত্য ও স্বতস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ।

.... যার ভিত্তি ন্যায়-বিচার ও সত্যের গলাগলি আর অন্যায়-অবিচার ও মিথ্যার সাথে পাঞ্জা লড়ালড়ি।

..... যার ভিত্তি নিরন্তর নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের ভিতর দিয়ে পরকালমুখী করে সাজিয়ে চলা।

...... যার ভিত্তি জীবন-প্রবাহের বিস্তৃত পরিসরে সবাইকে সবার অধিকার বুঝিয়ে দেয়া এবং অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

এ সবই বাস্তবতার রূপ নিয়ে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছিল তখন যখন সর্বত্র নেতৃত্ব ছিল ইসলামের। কর্তৃত্ব ছিল ইসলামের। যখন সব কিছুই আবর্তিত হতো ইসলামকে কেন্দ্র করে। ইসলামী অনুশাসনকে মাথায় রেখে। যখন একেবারেই অকল্পনীয় ছিল ইসলামবিহীন নেতৃত্ব কর্তৃত্ব।

সেদিন ভালো করে প্রমাণিত হয়েছিল জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামই উপযুক্ত।

আকীদা হিসাবে ইসলামই শ্রেষ্ঠ।

আদর্শ হিসাবে ইসলামই চির অনুসরণীয়।

এরপর লেখকের কলমে বড় বেদনাময় চিত্র ফুটে ওঠে। সে চিত্র মুসলিম উম্মাহ্‌র দুর্দিনের চিত্র। নেতৃত্ব থেকে তাদের দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চিত্র। তাদের অধঃপতনের করুণ চিত্র। যে অধঃপতন একদিকে ছিল যেমন আত্মিক, অন্যদিকে তেমনি বাহ্যিক। এখানে লেখক মুসলমানদের এই আত্মিক ও বাহ্যিক অধঃপতনের কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। ধর্মীয় অনুশাসনের মৌলিকত্ব থেকে দূরে সরে আসার ও নেতৃত্বহারা হওয়ার কারণে কী দুর্যোগ ও দুঃসময় নেমে এসেছিল তাদের ওপর এবং পাশাপাশি প্রায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে পূর্বের সেই জাহেলিয়াতের দিকে ছুটে যাওয়ার কারণে কী সর্বনাশা ঝড় বয়ে গিয়েছিল তাদের ওপর দিয়ে। সে চিত্রও লেখক তুলে ধরেছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়টাতেই অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নতির শীর্ষচূড়ায় উপনীত হয়।

লেখক অত্যন্ত আমানতদারী ও সততার সাথে এই চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে নেই উস্কানীমূলক কোন কথা। নেই আবেগোদ্দীপক কোন উপস্থাপনা। যা কিছু ঘটেছে এবং যেখানে ঘটেছে তা-ই তিনি অবিকল তুলে ধরেছেন কোন প্রকার অতিশয়োক্তি ও রংমিশ্রণ ছাড়াই।

হাঁ, এই চিত্র পাঠকের মনে বড় রেখাপাত করে। তার মনকে বড় গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। পাঠক এসব পড়তে পড়তে গভীরভাবে অনুভব করতে থাকেন যে, অবশ্যই চলমান জাহেলী নেতৃত্বের অবসান হতে হবে। দিশেহারা মানব কাফেলাকে এই জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ইসলামী নেতৃত্বের আলোকোজ্জ্বল ভুবনে নিয়ে আসতে হবে।

পাঠক আরো অনুভব করেন যে, দিশেহারা মানব কাফেলাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্যে ইসলামী নেতৃত্বের কী অপরিসীম প্রয়োজন এবং এই নেতৃত্বের অনুপস্থিতি মানুষের জন্যে কী ভয়ংকর ও বেদনায়ক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

সত্যি কথা হলো, মুসলমানদের নেতৃত্বের আসন থেকে দূরে সরে আসার কারণে যে ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসে, তা শুধু মুসলমানদের জন্যেই নেমে আসে না বরং তা গোটা মানবতাকেই গ্রাস করে ফেলে। পৃথিবীর ইতিহাস যার নজীর পেশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আরেকটু সামনে গিয়ে পাঠকের মনে নিজের অজান্তেই সৃষ্টি হয় অনুশোচনা ও আক্ষেপের অনুভূতি। স্রষ্টা প্রদত্ত দানের জন্যে সৃষ্টি হয় কৃতজ্ঞতাবোধ। সৃষ্টি হয় হারিয়ে যাওয়া মুসলিম নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের সংকল্পবোধও।

এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, নেতৃত্ব হারানোর ফলে মুসলিম উম্মাহর ওপর যে অধঃপতন নেমে এসেছে, লেখক সেই অধঃপতনকে 'জাহিলিয়াত' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। লেখকের এই ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা সব যুগের জাহেলিয়াতের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যুগের পরিবর্তনে জাহেলিয়াতের মধ্যে পোশাকী পরিবর্তন এলেও মৌলিকভাবে জাহেলিয়াত একই। ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত আর বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত একই পরিণতির দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। যেখানেই জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটবে, সেখানেই নীতি-নৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায় বোধ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং জাহেলিয়াতের কোন স্থান-কাল-পাত্র নেই বরং যখনই উম্মতের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বস দেখা দেবে, তখনই বুঝতে হবে জাহেলিয়াত তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে। যখনই উম্মাহ ইসলামী অনুশাসনকে এড়িয়ে বল্গাহারা জীবনে তৃপ্তি খুঁজে ফিরবে, তখনই বুঝতে হবে জাহেলিয়াতের বেড়াজালে তারা আটকা পড়েছে।

এই জাহেলিয়াতেরই করুণ পরিণতি ভোগ করছে আজ বিশ্ব মানবতা, যেমনটি ভোগ করেছিলো প্রাক-ইসলামী যুগের সেই বর্বর দিনগুলোতে।

লেখক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলেন ঃ

"মুসলিম বিশ্বের পয়গাম আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়। এই দাওয়াত কবুলের বিনিময় হিসাবে এই বিশ্ব ঘনঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে, মানুষের গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত বিশ্বের প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির দিকে এবং নানা ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের ছায়াতলে স্থান জুটবে। এ পয়গামের গুরুত্ব তুলনায় অনেক বেশি সহজ। আজ জাহেলিয়াত জনসমক্ষে অবমানিত। এর অবগুণ্ঠিত চেহারা আজ সবার সামনে উদ্ভাসিত। দুনিয়া আজ তার থেকে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। অতএব জাহেলী

নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে ইসলামী নেতৃত্বের দিকে আসার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তবে এজন্য একটাই শর্ত আর তা হলো, মুসলিম বিশ্বকে এজন্য মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং এই পয়গামকে অটুট মনোবল, দৃঢ় সংকল্প, নিষ্ঠা, হিম্মত ও সাহসিকতার সঙ্গে আপন করে নিতে হবে এবং এ বিশ্বাসে এগিয়ে যেতে হবে যে, দুনিয়ার মুক্তি ও পরিত্রাণ এর মাঝেই নিহিত এবং দুনিয়াকে ধ্বংস ও অধঃপতনের হাত থেকে কেবল এই পয়গামই নাজাত দিতে পারে।"

পরিশেষে এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে ইসলামী চেতনা ও ভাবধারা গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্যে খুব স্পষ্ট করে তা আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, এই গ্রন্থ নিছক ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থই নয়, বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়ে কীভাবে ইতিহাস লিখতে হবে তার একটি চমৎকার নমুনাও বটে। আর এ কাজ বড় জরুরী কাজ। কেননা আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করে এসেছি যে, ইতিহাস লেখার দায়িত্ব যেন শুধু য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকদেরকেই দেওয়া হয়েছে। আমরা যেন ইতিহাস লিখতেই জানিনা। অথচ এই য়ূরোপীয়রা ইতিহাস লিখতে গিয়ে শুধু তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়গান গেয়েছে। তাদের বস্তাপচা দর্শন ও স্বধর্ম-স্বজাতির পক্ষে বেসুরো জয়কীর্তন করেছে। আমরা জানিনা, এই একপেশে ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারা নিজেদের বিবেকের চোখ রাঙানীর সম্মুখীন হয়েছে কিনা। হলেও নিঃসন্দেহে তারা বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়নি। নইলে তাদের ইতিহাস এত বিভ্রান্তিকর, এতো বিকৃত ও এত ত্রুটিপূর্ণ হতো না।

অবশ্য এতে দুঃখ পেলেও আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা মানব জীবনের সত্যিকার মুল্যবোধ (যার দিকে ইসলাম দিক-নির্দেশ করেছে) সম্পর্কে ভীষণ গাফিলতি প্রদর্শন করে থাকে। অথচ এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সত্যিকারের মানবেতিহাস রচনা এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ চিত্রাংকন ও তার ফলাফল নির্ণয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আরেকটি ব্যাধি হলো, তারা য়ূরোপকেই সব কিছুর কেন্দ্রভূমি মনে করে। তাই অন্য দেশের এবং অন্য সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে (সে যত ভালোই হোক) তারা শুধু এ জন্যে এড়িয়ে যায় কিংবা স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করে যে, তার উৎপত্তিস্থল য়ূরোপ নয়। অপরদিকে কোথাও কোথাও ঠেকায় পড়ে যদি স্বীকৃতি দেয়ও তবু তা পরিবেশন করা হয় বিকৃতভাবে, গুরুত্বহীনভাবে।

য়ূরোপীয়রা মানব-জীবনের যে দিকগুলো ইতিহাস রচনাকালে এড়িয়ে গেছে

য়ূরোপীয়রা মানব-জীবনের যে দিকগুলো ইতিহাস রচনাকালে এড়িয়ে গেছে তা এই গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। এতে উল্লিখিত হয়েছে ইতিহাসের জন্যে অপরিহার্য ও অতি প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু। এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে মানবতার মাহাত্ম্যের স্বীকৃতির কথাও আলোচিত হয়েছে।

পাঠকের মনের কোণে প্রশ্ন আসতে পারে, এই গ্রন্থের লেখক, যিনি রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার একজন শ্রেষ্ঠ বাহক, যিনি বিশ্ব নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল, এই তিনি যখন নেতৃত্ব লাভের এবং নেতৃত্বদানের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন কি রুহানী শক্তি অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনের ব্যাপারেও আলোচনা করবেন? চলমান বিশ্বের আধুনিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্যে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের কথাটুকুও কি তিনি বলবেন?

বড় আনন্দের বিষয় যে, লেখক পাঠকের এই মনোভাবও বুঝতে পেরেছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ মানব জীবনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী সব বিষয়ের একটি বিরল সমষ্টি। এক সুসংহত শব্দচিত্র। লেখক তাঁর এই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত পংক্তিমালায় ইতিহাসকে বড় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন সঠিক দিক-নির্দেশনা।

গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই গ্রন্থ 'ইতিহাস কীভাবে রচিত হওয়া উচিত' তার একটি প্রকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ। য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকদের স্টাইল থেকে মুখ ফিরিয়ে (যাতে রয়েছে অসংগতি ও অসাম স্যতা, রয়েছে বিকৃতি ও সত্য-বিচ্যুতি, রয়েছে জ্ঞান-গবেষণার হাজারো দৈন্য) ইতিহাসমুখী আলোচনায় গবেষণায় কীভাবে কলম ধরতে হবে সে দিকনির্দেশনাও এখানে রয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমার নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি। আরেকটি আনন্দের বিষয় হলো, আমার মাতৃভাষা আরবীতেই আমি বইটি পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি যে ভাষা লেখকের প্রাণপ্রিয় ভাষা।

মিসরে এই গ্রন্থের আজ দ্বিতীয় সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে। আল্লাহ কবুল করুন।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ...

(সূরা কাফ)

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

৫ম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কী হারালো?

(ISLAM AND THE WORLD)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

রসূল আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ও সমকালীন বিশ্ব

এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ছিল মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় ও অধঃপতিত যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবতা যেভাবে অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল এ সময় সে তার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। গোটা বিশ্বে এমন কোন শক্তি ছিল না যা এই পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করতে পারে। অধঃপতনের গতি প্রতিদিনই দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল। এই শতাব্দীতে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে অবশেষে একদিন নিজেকেও ভুলে বসেছিল। পরিণতি সম্পর্কে ভাবলেশহীন ও বেখবর মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবার শক্তি থেকেও সম্পূর্ণ মাহরূম হয়ে গিয়েছিল। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের আওয়াজ বহুকাল চাপা পড়ে গিয়েছিল। যেসব প্রদীপ এসব পয়গম্বর ও নবী-রসূল জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন বাতাসের প্রচণ্ড তুফান তা হয় একেবারে নিভিয়ে দিয়েছিল অথবা তা এই ঘনঘোর অন্ধকারে এমন নিভু নিভু হয়ে গিয়েছিল যদ্দারা কেবল কয়েকজন আল্লাহ্‌ভক্তের দিলই রৌশন ও অলোকিত ছিল যা শহর তো দূরের কথা কয়েকটা গোটা বাড়িও আলোকিত করতে পারে না। দীনদার লোকেরা দীনের আমানত নিজেদের বুকের ভেতর আগলে রেখে জীবন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মঠ, গির্জা ও প্রান্তরের এক কোণে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল এবং জীবন সংগ্রাম, এর দাবি ও রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসেছিল। আর যারা জীবনের এই তুফানে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তারা রাজা-বাদশাহ ও দুনিয়াদার লোকদের সাথে স্বার্থের ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং তাদের অবৈধ কামনা-বাসনা ও জুলুম-নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় তাদের সহযোগী, বাতিল তথা অসৎ পন্থায় লোকের সম্পদ গ্রাস এবং তাদের শক্তি ও সম্পদ থেকে নাজায়েয ফায়দা লুটবার ক্ষেত্রে তাদের অংশীদারে পরিণত হয়েছিল।

রোমক ও পারসিকরা তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও দুনিয়ার কর্তৃত্বের ইজারাদারে পরিণত হয়েছিল। তারা ছিল দুনিয়ার জন্য উত্তম ও আদর্শ নমুনা হবার পরিবর্তে সর্বপ্রকার মন্দ ও ফেতনা-ফাসাদের পতাকাবাহী এবং যাবতীয় অপকর্মের গুরু ঠাকুর। বিভিন্ন সামাজিক ও চারিত্রিক রোগ-ব্যাধির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল এসব জাতিগোষ্ঠী বহুকাল থেকে। এদের লোক আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন এবং কৃত্রিম সভ্যতা-সংস্কৃতির সমুদ্রে ছিল আপাদমস্তক নিমজ্জিত। রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ অলস ঘুমে বিভোর এবং ক্ষমতার নেশায় বুঁদ ছিল। বিলাস জীবনের স্বাদ উপভোগ ও কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি ছাড়া দুনিয়ার বুকে তাদের আর কোন চিন্তা কিংবা লক্ষ্য ছিল না। জীবনের চাহিদা ও স্বাদ ভোগের লোভ তাদের এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন কিছুতেই ও কোনভাবেই তা পরিতৃপ্ত হতো না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী (প্রতিটি যুগের নিয়ম মাফিক) উপরিউক্ত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর পদাংক অনুকরণ করে চলতে চেষ্টা করত এবং এই অনুকরণকে সবচে' গর্বের বস্তু মনে করত। থাকল সাধারণ মানুষ! তা তারা তো জীবনের বোঝা, হুকুমতের দাবি ও করভারের চাপে এতটাই নিষ্পেষিত এবং দাসত্ব ও আইনের শেকলে এতটাই আবদ্ধ হয়েছিল যে, তাদের জীবন জীব-জানোয়ারের চাইতে আদৌ ভিন্নতর ছিল না। অপরের আরাম-আয়েশের জন্য পরিশ্রম ও হাড়ভাঙা খাটুনি এবং অন্যের আয়েশ ও বিলাসের জন্য নির্বাক পশুর মত সব সময় জোতা থাকা এবং পশুর মতই উদর পূর্তি ভিন্ন তাদের আর কোন হিস্যা ছিল না। কখনো যদি তারা এই শুষ্ক ও বিস্বাদ জীবন এবং এর একঘেয়ে চক্করে পড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত তখন নেশাকর বস্তু ও সস্তা আমোদ-প্রমোদ ও খেল-তামাশা দ্বারা নিজেদের মনকে ভোলাতে চাইত এবং কখনো যদি জীবনের এই যন্ত্রণা থেকে আরাম ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণের মওকা মিলত তখন অভুক্ত ও লোভাতুর মানুষের মত ধর্ম ও সর্বপ্রকার নীতি-নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে পাশবিক আনন্দের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

দুনিয়ার নানা অংশে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে এমন সব ধর্মীয় শৈথিল্য, আত্মবিস্মৃতি, সামাজিক অনাচার ও বিশৃংখলা ও নৈতিক অধঃপতন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল এসব দেশ অধঃপতন ও অধঃগতি এবং ধ্বংস ও অরাজকতার ক্ষেত্রে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় মাততে চায় এবং এটা ফয়সালা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি অন্যের চাইতে এগিয়ে আছে।

এক নজরে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী

এ যুগে বড় বড় ধর্ম বাচ্চাদের খেলার পুতুল এবং ভণ্ড মুনাফিকদের অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এসব ধর্মের আকার-আকৃতি ও প্রকৃতি

এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, যদি কোনভাবে ও কোনক্রমে ঐসব ধর্মের পিতৃপুরুষগণ দুনিয়ার বুকে পুনরাগমনপূর্বক তাঁদের রেখে যাওয়া ধর্মের অবস্থা দেখতে পেতেন তবে এটা অবধারিত যে, তাঁরা নিজেরাও তাঁদের ধর্ম চিনতে পারতেন না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্রগুলোতে আত্মম্ভরিতা, নৈরাজ্য ও নৈতিক অবক্ষয়ের রাজত্ব চলছিল। সরকারী প্রশাসনে ছিল সীমাহীন বিশৃঙ্খলা। শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের কঠোরতা প্রদর্শন এবং জনগণের চারিত্রিক অধঃপতনের পরিণতি হলো এই যে, গোটা জাতিই নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার আবর্তে জড়িয়ে গেল। দুনিয়ার সামনে পেশ করবার মত তাদের কাছে কোন পয়গাম ছিল না, ছিল না মানবতার জন্য কোন দাওয়াত। বস্তুত এই সব জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম ভেতরে ভেতরে ফোকলা হয়ে গিয়েছিল। তাদের জীবনের সূত্র শুকিয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে না ছিল ধর্মের দিক-নির্দেশনা আর না ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সুদৃঢ় ও যুক্তিযুক্ত কোন নীতিমালা।

খ্রিস্ট ধর্ম ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে

খ্রিস্ট ধর্মে এতটা বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা কখনো ছিল না যার আলোকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেত কিংবা এর ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেতে পারত অথবা তার দিক-নির্দেশনাধীনে কোন সালতানাত চলতে পারত। যা ছিল তা হযরত ঈসা মসীহ (আ) প্রদত্ত শিক্ষামালার একটা হালকা খসড়া চিত্রমাত্র যার ওপর তওহীদ তথা একত্ববাদের সহজ সরল বিশ্বাসের কিছুটা প্রলেপ ছিল। খ্রিস্ট ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যও ততদিন পর্যন্ত কায়েম ছিল যতদিন এই ধর্ম সেন্ট পলের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ছিল। সেন্ট পল এসে তো এই ছিটেফোঁটা অবশেষটুকুও মিটিয়ে দিলেন। নিভিয়ে দিলেন এর ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটুকুও। কেননা যেই পৌত্তলিক আবহে ও পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং যেই সব জাহিলী অশ্লীলতা ও বাজে কথন থেকে বের হয়ে এসেছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে তিনি সেই সব জিহালত (মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা) ও বাজে জিনিসের মিশ্রণ ঘটান। এরপর এল কনস্টানটাইনের শাসনামল। তিনি তাঁর শাসনামলে খ্রিস্ট ধর্মের অবশিষ্ট মৌলিকত্বটুকুও খুইয়ে দিলেন।

মোটকথা, খ্রি. ৪র্থ শতাব্দীতেই খ্রিস্ট ধর্ম একটি জগাখিচুড়িতে পরিণত হয় যার ভেতর গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী, রোমান পৌত্তলিকতা, মিসরীয় নব্য-প্লেটোবাদ (Neo-Platonism) ও বৈরাগ্যবাদের যোগ ছিল। হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র সহজ সরল শিক্ষামালার উপাদান এই জগাখিচুড়ির ভেতর এইভাবে হারিয়ে গিয়েছিল যেভাবে বারিবিন্দু বিশাল সমুদ্র বক্ষে পতিত হয়ে

আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্ম কতিপয় নিষ্প্রাণ প্রথা ও নিরানন্দ আকীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায় যা না পারত আত্মার মাঝে উত্তাপ সঞ্চার করতে আর না পারত জ্ঞান-বুদ্ধির বৃদ্ধির কারণ হতে। আবেগ-উদ্দীপনাকে তা সচল ও সক্রিয় করে তুলতে পারত না। তার মধ্যে এ যোগ্যতাও ছিল না যে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সংকটে মানব কাফেলার নেতৃত্ব দেবে। এর ওপর ধর্মের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল এর অতিরিক্ত যার পরিণতি হলো এই যে, খ্রিস্ট ধর্ম জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবের্ত সে নিজেই এ পথে বাঁধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং শতাব্দীর অব্যাহত অধঃপতনের দরুন কেবলই পৌত্তলিকতার ধর্মে পরিণত হলো। ইংরেজী ভাষায় কুরআন করীমের অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক জর্জ সেল (Sale) খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেনঃ

"The worship of saints and images, in particular, was then arrived at such a scandalous pitch that it even surpassed whatever is now practised among the Romanists."

খ্রিস্টানরা সাধু-সন্ত ও হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র মূর্তির পূজার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল যে, এ যুগের রোমান ক্যাথলিকরাও সেই সীমায় পৌঁছুতে পারেনি।[1]

রোম সাম্রাজ্যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ

অতঃপর স্বয়ং ধর্ম নিয়েই কালাম শাস্ত্রীয় বাহাছ তথা তর্ক-বিতর্কের ঝড় শুরু হয়ে যায় এবং নিষ্ফল মতানৈক্য ও মতবৈষম্যের হাঙ্গামা খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে জড়িয়ে ফেলে। এই দ্বন্দ্বে তাদের মেধা ও প্রতিভার অপচয় ঘটে এবং তাদের কর্মশক্তি স্থবির হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঘরোয়া বিবাদই বিরাট আকারের রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। শিক্ষাঙ্গন, গির্জা ও মানুষের বাড়িঘর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হয় এবং গোটা দেশই হয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধের শিকার। তাদের বিতর্কের বিষয় ছিল এই ঃ হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র ফিতরত তথা প্রকৃতি কি এবং এর মধ্যে খোদায়ী ও মানবীয় অংশের আনুপাতিক হার কত? রোম ও সিরিয়ার মালকানী (Malkite) খ্রিস্টানদের আকীদা ছিল এই যে, হযরত মসীহ (আ)-র প্রকৃতি হলো মিশ্রিত। তন্মধ্যে একটি অংশ হলো খোদায়ী এবং আরেকটি অংশ হলো মানবীয়। কিন্তু মিসরের মনোফিসীয় (Monophysites) খ্রিস্টানদের জিদ ছিল যে, মসীহ (আ)-র প্রকৃতি নির্ভেজাল খোদায়ী। এর মধ্যে তাঁর মানবীয়

1. Sale's translation,.P. 62.(1896)

প্রকৃতি এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যেভাবে সির্কার একটি ফোঁটা সমুদ্রে পতিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রথমোক্ত মত ছিল সরকারী মত। বায়যান্টাইন সম্রাটরা ও শাসক মহল একে ব্যাপকতর করতে এবং গোটা সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্মে পরিণত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এই মতের বিরোধীদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেয় যা ভাবতে গেলেও লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মতানৈক্য ও ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষ বেড়েই চলে। উভয় দলই একে অপরকে এমন ধর্মবহির্ভূত ও বেদীন মনে করত যে, দেখে মনে হতো, এরা বুঝি বা পরস্পরবিরোধী দুই স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী।[1] সাইরাসের দশ বছরের শাসনকালের (৬১৩-৪১ খ্রি) ইতিহাস পাশবিক শাস্তি ও লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনীতে ভরপুর।[2]

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অরাজকতা

রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। রাজ্যের প্রজাসাধারণ অসংখ্য বিপদের শিকার হওয়া সত্ত্বেও গোঁদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত তাদের ওপর দ্বিগুণ-চতুর্গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ছিল সরকারের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট এবং এ ধরনের সীমাহীন জুলুম-নিপীড়নের দরুন তারা স্বদেশী শাসনের মুকাবিলায় বিদেশী শাসনকেই অগ্রাধিকার দিত। ইজারাদারী (Monopolies) ওজোর-যবরদস্তি-পূর্বক ধন-সম্পদ ছিনতাই ছিল যেন বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এ সমস্ত কারণে বিরাট আকারে বিক্ষোভ ও হৈ-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ৫৩২ খ্রিস্টাব্দের হাঙ্গামায় একমাত্র রাজধানীতেই ত্রিশ হাজার মানুষের জীবনাবসান ঘটে।[3] তখনকার সময় ও সুযোগের দাবি ছিল ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ। কিন্তু লোকে অপচয়-অপব্যয়ে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনক্রমেই তা থেকে বিরত হতে রাজি হচ্ছিল না। তারা নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হয়েছিল। সবার মধ্যে কেবল একটা ধান্ধাই বিরাজ করছিল এবং সকলকে একই ভূতে পেয়ে বসেছিল যেনতেন প্রকারে সম্পদ আহরণ করতে হবে এবং সেই সম্পদ নিত্য-নতুন ফ্যাশন, আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাস এবং আপন আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার পেছনে ব্যয় করতে হবে। মানবতা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের ভিত্তি স্বস্থান থেকে সরে গিয়েছিল। সভ্যতা ও নৈতিকতা বিদায় নিয়েছিল। পরিস্থিতি এত দূর গড়িয়েছিল যে, লোকে পারিবারিক ও

1. Alfied J. Butler, Arabs conquest of Egypt and last thirty years of the Roman Dominion, p. 29-30.
2. প্রাগুক্ত, ১৮৩-৮৯;
3. Encyclopaedia Britannica. Art. Justin.

বৈবাহিক জীবনের ওপর চিরকুমার জীবনকে প্রাধান্য দিত যাতে সে স্বাধীন ও বল্গাহীন জীবন যাপনের সুযোগ পায়।[১] ন্যায় ও সুবিচারের অবস্থা ছিল এই যে, সেল-এর ভাষায় ঃ যেভাবে বিবিধ দ্রব্য ও বস্তুসামগ্রী বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং সে সবের মূল্য নির্ণীত ও নির্ধারিত হয় ঠিক সেভাবেই ন্যায় ও সুবিচারও ক্রয়-বিক্রয় হতো। ঘুষ ও আমানতের খেয়ানত তথা গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাতকে স্বয়ং জাতির পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হতো।[২] ঐতিহাসিক গীবন বলেন: খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।[৩] এর উদাহরণ হলো শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত সেই ফলবান বৃক্ষ যার ছায়াতলে পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠী এককালে আশ্রয় নিত। আর এখন সেই বৃক্ষের কেবল কাণ্ডটাই দাঁড়িয়ে আছে এবং শুকোতে শুকোতে শেষ দশায় এসে পৌঁছেছে।[৪] Historian's History of the World-এর লেখক বলেন :

"That it (Byzantine Empire) had nevertheless suffered very severely in the general decline caused by over-taxation, and by reduced commerce, neglected agriculture and diminished population, is attested by the magnificent ruins of cities which had already fallen to decay, and which never regained their ancient prosperity."

"বড় বড় শহরে দ্রুততার সাথে ধ্বংস ও অধঃপতন নেমে এল। এরপর সেসব শহর সেই ধ্বংসের ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি, পারেনি তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। সেগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, বায়যান্টাইন হুকুমত সে সময় চরম অধঃপতিত অবস্থায় ছিল আর এই অধঃপতন অতিরিক্ত করের চাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা, কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতা ও ঔদাসীন্য এবং শহরগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের ফলেই ঘটেছিল।"[৫]

য়ুরোপের উত্তর ও পশ্চিমের জাতিগোষ্ঠী

সেসব পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী যারা উত্তর ও পশ্চিমে বসবাস করত তারা ছিল অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার, ছিল রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-হানাহানিতে ক্ষতবিক্ষত। তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও অজ্ঞতা-মূর্খতা থেকে সৃষ্ট ঘোর অন্ধকারে হাত-পা ছুঁড়ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা আলোকিত করে তুলতে তখনো

1. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭.
2. Sale's translation. p, 72.
3. Gibbon , The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. V. p. 31.
4. 3. Ibid, Vol. V. p. 31.
5. Historion's History of the World. vol. vii-p.175.

ও সব দেশের ভাগ্যাকাশে মুসলিম স্পেনের অভ্যুদয় ঘটেনি। তাছাড়া বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকও তাদের চোখ খুলতে সাহায্য করেনি। মোটকথা ,এই সব জাতিগোষ্ঠী মানব সভ্যতার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা যেমন বিশ্বজগত সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর ছিল তেমনি পৃথিবীর লোকও তাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলোতে যেসব বিপ্লবাত্মক ঘটনা ও পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল সেসবের সঙ্গে এসব জাতিগোষ্ঠীর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে এসব জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল নবীন অভিজ্ঞতাহীন খ্রিস্ট ধর্ম ও প্রাচীন মূর্তি পূজার মাঝামাঝি। এইচ.জি. ওয়েলস (H.G. Wells) বলেন ঃ তাদের কাছে না দীনের কোন পয়গাম ছিল আর না রাজনীতির ময়দানে তাদের কোন উচ্চ আসন ছিল। তৎকালে পশ্চিম য়ুরোপে ঐক্য-সংহতি ও আইন-শৃঙ্খলার কোন চিহ্নমাত্র মাত্র ছিল না।[১]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেনঃ "From the fifth to the tenth century Europe lay sunk in a night of barbarism which grew darker and darker. It was a barbarism far more awful and horrible than that of the primitive savage, for it was the decomposing body of what had once been a great civilization. The features and impress of that civilization were all but completely effaced. Where its development had been fullest, e.g., in Italy and Gaul, all was ruin, squalor, dissolution."

"খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপে গভীর অন্ধকার ছেয়ে ছিল এবং তা ক্রমশ অধিক গভীর ও ভয়াবহ হয়েই চলেছিল। তখনকার ভয়-ভীতি ও বর্বরতা ছিল প্রাচীনকালের ভয়-ভীতি ও বর্বরতার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। কেননা এর উদাহরণ ছিল এক বিরাট সভ্যতার লাশের যে লাশ পচে ও গলে গিয়েছিল। সেই সভ্যতার চিহ্নাদি লোপ পাচ্ছিল এবং তার ওপর ধ্বংসের মোহর লেগেছিল। সে সমস্ত দেশ যেখানে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল যেমন ইটালী, ফ্রান্স, সেখানে ধ্বংসের তাণ্ডব, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলারই রাজত্ব চলছিল।"[২]

য়াহূদী জাতিগোষ্ঠী

য়ূরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী য়াহূদী নামক জাতিগোষ্ঠী দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর ভেতর এদিক দিয়েও অনন্য ছিল যে, তাদের নিকট দীন (ধর্ম)-এর এক বিরাট বড় পুঁজি ছিল এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয়

1. A shorf History of the World vol. vii-p.170.
2. Robert Brifault, The Making of Humanitv. v. p. 164.

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরিভাষাসমূহ অনুধাবনের সর্বাধিক যোগ্যতা ছিল। কিন্তু এই য়াহূদীরা ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই মর্যাদার অধিকারী ছিল না যাতে তারা অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, বরং অন্যেরা তাদেরকে শাসন করবে, সর্বদা তারা অন্যের জুলুম-নিপীড়ন সইবে, নানা রকম শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করবে, বিবিধ প্রকারের কঠোরতা ও ভয়-ভীতির শিকার হবে, এটাই ছিল তাদের ভাগ্যলিপি। দীর্ঘকাল ধরে গোলামি জীবন যাপন এবং নানা ধরনের কঠোরতা ও শাস্তি ভোগের দরুন তাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। জাতিগত অহমিকা, গোত্রীয় ও বংশগত অহংকার, ধন-সম্পদের প্রতি সীমাতিরিক্ত লোভ-লালসা, অব্যাহত সুদী কারবারের দরুন বিশেষ ধরনের চরিত্র ও মানসিকতা, জাতিগত অভ্যাস ও স্বভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং এক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি ছিল না। দুর্বল ও বিজিত অবস্থায় লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়া ও বিজয়ী জাতিকে খোশামোদ-তোষামোদ করা আর বিজয়ী হতেই বিজিত জাতির সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ এবং সাধারণ অবস্থায় প্রতারণা, শঠতা, মোনাফেকী, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও স্বার্থপরতা, বিনা পয়সায় অপরের শ্রমের ফসল ভোগ, হারামখোরী, সত্যের পথে লোকদের বাধা প্রদান তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুরআনুল করীম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তাদের এই অবস্থার খুবই খোলাখুলি ও পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছে এবং বলেছে যে, নৈতিক অবনতি, মানবিক অধঃপতন ও সামাজিক অনাচার-অরাজকতার মধ্যে তারা কোন্ স্তরে অবস্থান করছিল এবং কোন্ ও কী কারণে তারা চিরদিনের জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব ও পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার হারাল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে য়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, এদের এক পক্ষ অপর পক্ষকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও হেনস্তা করতে, প্রতিপক্ষ থেকে আপন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিশোধ নিতে এবং বিজিত পক্ষের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করতে কোন রকম কসুর করত না। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে য়াহূদীরা এন্টিয়কে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্রাট ফোকাস এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বিখ্যাত সমর অধিনায়ক বোনোসূস (Bonosus)-কে প্রেরণ করেন। তিনি গোটা য়াহূদী বসতিকে এভাবে উচ্ছেদ করেন যে, হাজার হাজার য়াহূদীকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করে, শত শত লোককে নদীবক্ষে ডুবিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে এবং আরও বহু লোককে হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করে শেষ করেন। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানীরা যখন শাম দেশ (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীনসহ বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এখন থেকে আমরা শাম-এর পরিবর্তে সিরিয়া ব্যবহার করব। -আনুবাদক) জয় করে তখন

য়াহূদীদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় সম্রাট খসরূও খ্রিস্টানদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালান এবং অধিকাংশ খ্রিস্টানকে হত্যা করেন। ইরানীদের ওপর বিজয় লাভের পর সম্রাট হেরাক্লিয়াস আহত ও নিপীড়িত খ্রিস্টানদের পরামর্শে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে য়াহূদীদের থেকে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করেন যে, গোটা রোমক সাম্রাজ্যে কেবল সেই সব য়াহূদীই প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল যারা দেশ থেকে পালাতে কিংবা কোথাও আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিল।[১] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বিরাজমান এই দুই মহান ধর্মের অনুসারীদের এই নৃশংসতা, বর্বরতা ও রক্তপিয়াসী মানসিকতার কাছে কি এ আশা করা যেত যে, তাদের শাসনামলে তারা মানবতার রক্ষক হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করবেন এবং সত্য, সুবিচার, শান্তি ও সমঝোতার পয়গাম দুনিয়াবাসীকে শোনাবেন?

ইরান ও সেখানকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনসমূহ

সভ্য দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে ইরান ছিল রোম সাম্রাজ্যের অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ছিল মানবতার শত্রুগোষ্ঠীর তৎপরতার পুরনো লীলাভূমি। সেখানে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি বহুকাল থেকেই নড়বড়ে অবস্থায় চলে আসছিল। যে সব আত্মীয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে পৃথিবীর সভ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাগণ সর্বদাই অননুমোদিত ও বেআইনী মনে করে এসেছে এবং প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা করে থাকে– ইরানীরা সেসব সম্পর্ককে ঘৃণ্য ও অবৈধ বলে স্বীকার করত না। সম্রাট ২য় ইয়াযদাগির্দ, যিনি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজত্ব করেছিলেন, আপন কন্যাকে বিবাহ করেন, অতঃপর তাকে হত্যা করেন।[২] খ্রি. ষষ্ঠ শতাব্দীর শাসক বাহরাম চূবীন আপন বোনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[৩] অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিনসেন-এর বর্ণনা মুতাবিক ইরানে এ জাতীয় সম্পর্ককে কোন রকম অবৈধ কাজ বলে মনে করা হতো না, বরং একে ইবাদত ও পুণ্য কর্ম মনে করা হতো। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেন যে, ইরানী আইনে ও সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রকার সম্পর্কের বাছ-বিচার ছিল না।[৪]

খ্রি. ৩য় শতাব্দীতে দুনিয়ার বুকে মানীর আবির্ভাব ঘটে। তার আন্দোলন ছিল বস্তুতপক্ষে দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র যৌনপ্রবণতার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক ও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং আলো ও আঁধারের মনগড়া দ্বন্দ্বের (যা ছিল ইরানের প্রাচীন

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. কিতাব আল-খুতাতু'ল মাকরীযিয়্যা; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯২ এবং The Arabs conquest of Egypt. p. 133-34.
২. Historion's History of the World. vol. viii-p.84.
৩. তাবারী, ৩ খণ্ড, ১৩৮; ৪. সাসানী আমলে ইরান, ৪৩০ পৃ.।

দর্শন) ফলশ্রুতিস্বরূপ। অনন্তর মানী চিরকুমার জীবন অবলম্বনের আহ্বান জানান যাতে দুনিয়া থেকে যাবতীয় মন্দ ও অন্যায়-অনাচারের জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি এই দার্শনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আলো ও আঁধারের মিশ্রণই যাবতীয় অনাসৃষ্টির কারণ। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। এরই ভিত্তিতে তিনি বিয়েকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যাতে করে মানুষ যথাসত্বর নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এভাবে মানব জাতির অবলুপ্তির মাধ্যমে আলো অন্ধকারের ওপর চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করে। বাহরাম ২৭৬ খ্রিস্টাব্দে মানীকে এই বলে হত্যা করেন যে, এই লোকটি বিশ্বের ধ্বংসের আহ্বান জানাচ্ছে। এজন্য দুনিয়া খতম হবার আগে এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পূর্বে তার নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু মানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নিহত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচারিত শিক্ষা বহু দিন যাবত বেঁচে ছিল এবং মুসলিম বিজয়ের পরেও এর প্রভাব অবশিষ্ট ছিল।

ইরানের পতিত ও অনাবাদী প্রকৃতি আরেকবার মানীর প্রকৃতি বিরোধী শিক্ষামালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ মাযদাক (জন্ম ৪৮৭ খ্রি.) -এর দাওয়াতরূপে আবির্ভূত হয়। মাযদাক ঘোষণা করলেন যে, তামাম মানবগোষ্ঠী অভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের ভেতর কোন পার্থক্য নেই। অতএব প্রত্যেকেরই অপরের মালিকানায় সমঅধিকার রয়েছে। আর যেহেতু সম্পদ ও নারীই এমন দুটো উপাদান যার নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ মানুষ যত্নের সাথে করে থাকে তাই এই দুটো ক্ষেত্রে সাম্য ও সমশরীকানা সর্বাধিক প্রয়োজন। শাহরাস্তানীর ভাষায় ঃ মাযদাক মহিলাদেরকে সকলের জন্য বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং বিত্ত-সম্পদ ও নারী আগুন, পানি ও ঘাসের মত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও ব্যবহারযোগ্য ঘোষণা দেন।[১]

যুবক ও ভোগলিপ্সু বিলাসপ্রিয় লোকেরা এই ঘোষণায় যেন হাতে স্বর্গ পেল। ফলে এই ঘোষণা সত্বরই আন্দোলনে পরিণত হলো। তারা এই আন্দোলনকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল। মজার ব্যাপার এই যে, ইরান সম্রাট কুবায স্বয়ং এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এর প্রচার ও প্রসারে বিরাট তৎপরতার পরিচয় দেন। ফল দাঁড়াল এই যে, এই আন্দোলন সর্বত্র দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র ইরান এই যৌন অনাচার ও অরাজকতার প্লাবনে নিমজ্জিত হলো। ঐতিহাসিক তাবারানীর ভাষায় ঃ

"ভবঘুরে, মস্তান ও বখাটে প্রকৃতির লোকেরা একে দুর্লভ সুযোগ মনে করল এবং মাযদাক ও মাযদাকীদের উৎসাহী সাথী ও সমর্থকে পরিণত হলো। সাধারণ

১. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, শাহরাস্তানীকৃত; ২য় খণ্ড, ৮৬।

নাগরিকগণ এই আকস্মিক দুর্যোগের শিকার ছিল। এই আন্দোলন এতটা শক্তি সঞ্চয় করে যে, যে চাইত, যার ঘরে চাইত ঘরের মাল-মাত্তা ও মহিলাদেরকে ভোগ-দখল করত। বাড়ির মালিক কিছুই করতে পারত না। মাযদাকীরা সম্রাট কুবাযকে প্ররোচিত করে এবং তাকে প্রয়োজনে পদচ্যুত করার হুমকি প্রদর্শন করে যাতে করে সম্রাট এই আহবানে নিজেও সাড়া দেন। ফল দাঁড়াল এই যে, দেখতে না দেখতেই এমন অবস্থা হলো যে, বাপ তার সন্তানকে যেমন চিনতে পারত না, তেমনি সন্তান চিনতে পারত না তার বাপকে। কারোরই কারোর মালিকানাধীন জিনিসের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, দখল ছিল না।[১]

ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা, "এই আন্দোলনের পূর্বে সম্রাট কুবায ইরানের সর্বোত্তম শাসকদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু মাযদাকের আনুগত্যের দরুন রাষ্ট্রীয় সীমায় ও সীমান্তে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।"[২]

ইরানের সম্রাটপূজা

ইরানের রাজা-বাদশাহগণ যাদের উপাধি ছিল কিসরা (খুসরাও), দাবি করত যে, তাদের শিরা-উপশিরায় খোদায়ী রক্ত প্রবাহিত। ইরানের জনগণও তাদেরকে সেই নজরেই দেখত যেন তাদের সম্রাটই তাদের খোদা। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের ঐসব সম্রাটের প্রকৃতিতে একটি পবিত্র আসমানী বস্তু রয়েছে। অনন্তর এসব লোক তাদের সম্রাটকে সিজদা করত এবং তাদের ওপর উলূহিয়াত তথা ঈশ্বরত্ব আরোপ করে তাদের জয়গান গাইত। তারা তাদেরকে আইনের কোন প্রকার সমালোচনার, এমন কি মানবত্বের ঊর্ধ্বে বলে জ্ঞান করত। ভক্তির আতিশয্যে সম্রাটের নাম তারা মুখে আনত না। কেউ তাদের দরবার কিংবা মজলিসে বসতেও সাহস করত না। ইরানের জনগণের বিশ্বাস ছিল যে, ঐসব সম্রাটের প্রত্যেক মানুষের ওপর জন্মগত অধিকার রয়েছে, কিন্তু অন্য কারো সম্রাটের ওপর অধিকার নেই। কোন সম্রাট তার সম্পদের থেকে কাউকে কিছু দিলে কিংবা দস্তরখান থেকে এক টুকরো কাউকে প্রদান করলে এটা একান্ত তার দয়া ও বদান্যতা; কারুর কিছু দাবি করার অধিকার নেই। নির্দেশ পালন ছাড়া জনগণের আর কোন অধিকার নেই। দেশ ও জাতির ওপর শাসন দণ্ড পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ পরিবারের (কায়ানী পরিবার) একচেটিয়া অধিকার ছিল। ইরানের জনগণ মনে করত যে, কেবল ঐ পরিবারের লোকেরাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং সাম্রাজ্যের কেবল তারাই মালিক হতে পারেন। আর এই অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা থেকে পুত্রে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত হতে থাকবে। এতে কারোর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। অনন্তর জনগণ সমকালীন

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮। ২. .প্রাগুক্ত।

সম্রাটের ওপর ঈমান রাখত এবং হুকুমতকে শাহী খান্দানের মৌরছী অধিকার মনে করত, যে অধিকারে নাক গলাবার ক্ষমতা কারোর ছিল না। যদি ঐ পরিবারে কোন প্রবীণ ও বয়স্ক লোক না পাওয়া যেত তাহলে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন শিশুকেই নিজেদের সম্রাট হিসেবে মেনে নিত। যদি পুরুষ না পাওয়া যেত তবে কোন মহিলাকেই রাজমুকুট পরিধান করানো হতো। অনন্তর শায়রূয়ার পর তার সাত বছর বয়স্ক পুত্র আর্দেশীরকে সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং একইভাবে খুসরাও (খসরু)-কে ও পারভেযের পুত্র ফররুখযাদ খুসরাও (খসরু)-কেও শিশুকালেই লোকেরা সম্রাট ঘোষণা দেয়। কিসরা কন্যা পুরান দখ্‌তও সিংহাসনে উপবেশন করেছিল। অপর কন্যা আযরমীদখ্‌তও সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিল।[১] কারোর কল্পনায়ও আসেনি যে, কোন সিপাহসালার কিংবা বড় সর্দার অথবা অপর কোন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে (যেমন রুস্তম ও জাবান ছিলেন) সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করা যেতে পারে। যেহেতু শাহী পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না সেহেতু তাদের সম্পর্কে ভাবার প্রশ্নই ওঠেনি।

ধর্মীয় খান্দান এবং নেতৃস্থানীয় সর্দার ও সামন্ত প্রভুদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, এই সব লোক সাধারণ লোকের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের। তাদের ব্যক্তিত্ব ও তাদের মন-মস্তিষ্ক অপরাপর মানুষের থেকে পৃথক। এইসব লোককে ইরানের লোকেরা সীমাহীন ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। উঁচু-নীচুর পার্থক্য, শ্রেণী বৈষম্য ও বিভিন্ন পেশার বিভক্তি ইরানী সমাজ ও জীবন যাপন পদ্ধতির অনড় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যার ভেতর পরিবর্তন ছিল অসম্ভব। অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিনসেনের ভাষায় ঃ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান ও দূরত্ব ছিল।[২] হুকুমতের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল যে, তারা কোন আমীর-উমারার স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করতে পারবে না।[৩] সাসানী রাজনীতির এই অপরিবর্তনীয় নীতি ছিল যে, কখনো কোন লোক জন্মসূত্রেপ্রাপ্ত মান-সম্মানের চাইতে বড় কোন কিছুর প্রত্যাশী হবে না।[৪] কোন লোকের পক্ষে তার জন্মগত পেশা পরিত্যাগ করে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করা বৈধ ছিল না।[৫] পারস্য সম্রাটগণ হুকুমতের কোন কাজ কিংবা দায়িত্ব কোন নীচ শ্রেণী কিংবা বংশের লোকদের সোপর্দ করতেন না।[৬] সাধারণ গণমানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট বৈষম্য ও ভেদ-রেখা ছিল। সমাজে সকলের একটি সুনির্ধারিত স্থান ছিল।[৭]

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড ও তারীখে ইরান, ম্যাকারিয়াস ইরানীকৃত;
২-৭. সাসানী আমলে ইরান, পৃ. যথাক্রমে,৫৯০, ৪২০, ৪১৮, ৪২২, ৪২২ ও ৪২১;

ইরানীদের জাত্যাভিমান

ইরানের লোকেরা তাদের ইরানী জাতীয়তাকে সম্মান-সম্ভ্রম ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখত। নিজেদের সম্পর্কে তারা এই ভেবে বসেছিল যে, পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠী ও বংশ-গোত্রের ওপর এই জাতি ও বংশের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এমন সব বিশেষ যোগ্যতা ও প্রকৃতিগত সামর্থ্য দান করেছেন যে ক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি নেই। এরা তাদের চতুষ্পার্শ্বের জাতিগোষ্ঠীকে খুবই অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদেরকে অবজ্ঞামূলক ও বিদ্রূপাত্মক নামে অভিহিত করত।

আগুন পূজা এবং মানব জীবনে এর প্রভাব

আগুন যেহেতু না পারে তার পূজারীদেরকে পথ প্রদর্শন করতে, আর না পারে দিক-নির্দেশনা দিতে, আর তার ভেতর এই শক্তিও নেই যে, সে তার পূজারীদের জীবন সমস্যার সমাধান দেবে, এ ব্যাপারে তার ভূমিকা পালন করবে এবং অপরাধী, পাপী ও হাঙ্গামাবাজদের প্রতিরোধ করবে। ফলে অগ্নিপূজকদের ধর্ম কতিপয় প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হলো। ওসব অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ কতকগুলো সময় ও বিশেষ বিশেষ কতক জায়গায় পালন করা হতো। উপাসনাগৃহের বাইরে নিজেদের ঘরে ও বাজারে, প্রভাবাধীন গণ্ডির ভেতর এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে তারা ছিল একেবারেই স্বাধীন ও বল্গাহীন। তাদের মন যা চাইত তাই করত। তারা তাদের খেয়াল-খুশি মত কিংবা উপযোগিতা ও সময়ের দাবি মাফিক কাজ করত। প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি দেশে সাধারণভাবে কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা ছিল এরকমই।

মোটকথা, ইরানের লোকেরা এমন একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দীন থেকে বঞ্চিত ছিল যা তাদের সংস্কার-সংশোধন করতে, তাদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করতে, তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনাকে সংযত এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে পারত, যে দীন খানদানের জীবন ব্যবস্থা আর রাষ্ট্রের সংবিধানরূপে শাসকদের যবরদস্তি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিরোধ করতে, অত্যাচারী জালিমদের নিবৃত্ত করতে এবং মজলুমের অনুকূলে ন্যায় ও ইনসাফ করতে সমর্থ হতো। কিন্তু অগ্নিপূজারী ইরানীদের ভাগ্যে এমন একটি দীন জোটেনি যা ওপরেই উক্ত হয়েছে। আর তাই ইরানের অগ্নিপূজক এবং দুনিয়ার অপরাপর ধর্মহীন ও বল্গাহীন উচ্ছৃংখল লোকের ভেতর নৈতিক চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য ছিল না।

বৌদ্ধ মতবাদ এবং এর পরিবর্তন ও বিকৃতি

বৌদ্ধ মতবাদ তার সহজ সারল্য ও আপন বৈশিষ্ট্য অনেক আগেই খুইয়ে ফেলেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এবং তার অবতার ও দেবতাসমূহকে আত্তীকরণ করে নিজের অস্তিত্বকেই হারিয়ে ফেলেছিল। গুস্তাভ-লী-বন তমদ্দুন-ই হিন্দ বা Indian Civilisation নামক গ্রন্থে এমত মতই প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ তাকে হজম করে আত্তীকরণ করে ফেলেছিল। যা-ই হোক, দীর্ঘ কাল থেকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে চলে আসা এই দুটো ধর্ম একাকার হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধমতবাদ মূর্তি পূজার ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। যেসব দেশেই এই ধর্মের অনুসারীরা গেছে সেখানেই তারা মূর্তি সাথে নিয়ে গেছে এবং যেখানেই যেত সেখানেই যে কাজটি তারা সর্বপ্রথম করত তা হলো গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন এবং তার প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি তৈরিকরণ। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঐসব প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা ঢাকা দেখতে পাওয়া যায়।[১]

এসব প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতি বেশির ভাগ বৌদ্ধ মতবাদের উৎকর্ষের যুগেই নির্মিত হয়েছিল। অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তদীয় 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (হিন্দুস্তানী তমদ্দুন) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"বৌদ্ধ মতবাদ (ধর্ম)-এর ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভেতর অবতারের ছড়াছড়ি এবং মূর্তিপূজার অবাধ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দেখা যেতে লাগল। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য-নতুন প্রথা-পদ্ধতি একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।"[২]

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু তাঁর The Discovery of India গ্রন্থে বৌদ্ধ মতবাদের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ মতবাদও তাই করল। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে যাদু ও নানারূপ অলীক কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ভারতবর্ষে সহস্র বর্ষব্যাপী নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ মতবাদের অবনতি শুরু হয়।" এই সময় তার যে রোগাক্রান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে Mrs. Rhys Davids বলেন ঃ

১ .বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন রাজধানী তক্ষশীলার যাদুঘর পরিদর্শনকারী একজন দর্শক ঐসব মূর্তি ও প্রতিমূর্তি (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্র.)

২. ঈশ্বর টোপাকৃত হিন্দুস্তানী তমদ্দুন (উর্দু)'।

"এসব রোগাক্রান্ত কল্পনাপ্রবণতার গভীর ছায়ার নীচে পড়ে গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়, একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের জন্ম ঘটে এবং তা বিস্তার লাভ করে। এরপর তদস্থলে আরেকটি ধারণা জন্ম নেয়। অতঃপর পদে পদে এক একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিতে থাকে, এমন কি গোটা পরিবেশের মধ্যে মস্তিষ্কপ্রসূত এই ধূম্রজাল ছেয়ে যায় এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদ্‌গাতার সহজ সরল ও সমুন্নত নৈতিক শিক্ষা ঐসব কাল্পনিক সূক্ষ্ম জটাজালের নিচে চাপা পড়ে যায়।[১] সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল পতনোন্মুখ এবং এগুলোর মধ্যে অনেক নীচ জাতীয় প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ফলে এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল।"[২]

মোদ্দাকথা, চীনসহ বৌদ্ধ মতবাদের অনুসারীদের কাছে বিশ্বের জন্য দেবার মত কোন পয়গাম ছিল না যার আলোকে গোটা বিশ্ব তার সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজতে পারে এবং আল্লাহপ্রদত্ত সহজ-সরল রাস্তা পেতে পারে। চীনারা সভ্য দুনিয়ার একেবারে পূর্ব প্রান্তে নিজেদের তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় উত্তরাধিকারকে আঁকড়ে ধরে ছিল যাদের মধ্যে না ছিল নিজেদের বাড়তি কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর না ছিল অন্যদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করার কোনরূপ যোগ্যতা।

মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠী (যেমন মুগল, তুর্ক, জাপানী প্রভৃতি) বিকৃত বৌদ্ধ মতবাদ ও বর্বরতাপূর্ণ মূর্তিপূজার মাঝে অবস্থান করছিল। তাদের কাছে না ছিল জ্ঞানগত কোন সম্পদ আর না ছিল কোন উন্নত রাজনৈতিক

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) পরিদর্শনের পর বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন যা বৌদ্ধ ধর্মের মাটির নিচে চাপাপড়া শহর সমূহ খননের পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই ধর্ম ও সভ্যতা নির্ভেজাল মূর্তি পূজার ধর্ম ও সভ্যতায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গুস্তাভ লী বোঁ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রাসাদ, দালান-কোঠা ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ দৃষ্টে এমত সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। তিনি তদীয় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

আসল বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও উপলব্ধি করবার জন্য এই ধর্মের গ্রন্থাদি নয়, বরং স্মারক চিহ্নসমূহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। স্মারক চিহ্নসমূহ থেকে যেই শিক্ষা আমরা পাই তা পুস্তক থেকে প্রাপ্ত যা য়ূরোপীয় লেখকগণ শেখানো শিক্ষা থেকে একেবারেই পৃথক। এসব স্মারক চিহ্ন প্রমাণ দেয় যে, যে ধর্মকে য়ূরোপীয় পণ্ডিতগণ ইলহাদী তথা খোদাদ্রোহী ধর্ম বলেন বাস্তবে তা মূর্তিপূজা ও বহু উপাস্যের ধর্মের শিরোমণি। (তমদ্দুনে হিন্দ. পৃ. ২৬৫)

১. Discovery of India, P. 201, 203.

২. প্রাগুক্ত;

ব্যবস্থা ও নীতিমালা। আসলে এসব জাতিগোষ্ঠী একটি মধ্যবর্তীকাল অতিক্রম করছিল । তারা মূর্খতাসর্বস্ব মূর্তিপূজা থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী এমনও ছিল যারা সে সময় পর্যন্ত নগর সভ্যতা ও নগর জীবনের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছিল।

ভারতবর্ষ ঃ ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে যেই যুগ শুরু হলো তা ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এই দেশের ইতিহাসের, (যা কোনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল) সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত ও অন্ধকারতম যুগ ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে এই দেশটি কারোর চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এছাড়া এই দেশটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলোঃ ১. দেবদেবীর সংখ্যাধিক্য; ২ . যৌন উচ্ছৃংখলা; ৩. জাতিভেদ ও শ্রেণী বৈষম্য।

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মূর্তিপূজার ছিল রমরমা অবস্থা। বেদে দেবতাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩, ঐ শতাব্দীতে এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ৩৩ কোটিতে উন্নীত হয়। এই যুগে পসন্দনীয় বস্তু, আকর্ষণীয় জিনিস, প্রয়োজন পূরণে সক্ষম বস্তু মাত্রই পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়। ফলে তাদের পূজ্য মূর্তি. প্রতিকৃতি, দেবতা ও দেবদেবীর সংখ্যার কোন ইয়ত্তা ছিল না। এসব দেবতা ও পূজ্য বস্তুর মধ্যে খনিজ দ্রব্য, জড় বস্তু, বৃক্ষাদি, উদ্ভিদরাজি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জীব-জন্তু, এমন কি যৌনাঙ্গও শামিল ছিল। আর এভাবে এই প্রাচীন ধর্ম গল্পলোকের কল্পকাহিনী, আকীদা-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার একটি দেব-উপাখ্যানে পরিণত হয়। ড. Gustave le Bon তাঁর Les Civilisations de la Inde নামক গ্রন্থে লিখছেনঃ

"The Hindu, of all people, stands most unavoidably in the need of visible objects for religious worship, and although at different times religious reformers have tried to prove monotheism in the Hindu faith, it has been an unavailing effort. From the Vedic Age to the present day, the Hindu has been worshipping all sorts of things. Whatever he cannot understand or control is worthy of being adored as divine in his eyes. All attempts of Brahmans and other Hindu reformers in the direction of monotheism or in limiting the number of gods to three have been utterly unsuccessful. The

Hindus listened to them, and sometimes even accepted their teachings in principle, but in practice the three gods went on multiplying till they began to see a god in every article and phenomenon of nature."

"দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু এমন একটি জাতি যাদের পূজায় বাহ্যিক একটা না একটা অবয়ব থাকতেই হবে। যদিও বিভিন্ন যুগে ধর্মীয় সংস্কারকগণ হিন্দু ধর্মে একত্ববাদ রয়েছে বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের এই প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল। হিন্দুদের নিকট বৈদিক যুগেই হোক আর বর্তমানকালেই হোক, প্রতিটি বস্তুই অবোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য আরাধ্য উপাস্য। ব্রাহ্মণ ও দার্শনিক পণ্ডিতদের কেবল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াসই নয়, বরং তাদের সেই সমস্ত প্রয়াসও যা তারা দেবদেবীর সংখ্যা কমিয়ে তিনে আনার জন্যে চালিয়েছে তা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের শেখানো কথা শুনেছে এবং কবুল করেছে, কিন্তু কার্যত এতে করে তাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস পায় নি, বরং তা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং প্রতিটি রঙ, রূপ, বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে তারা তাদের অবতার দেখতে পেয়েছে।"[১]

খ্রি. ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে মূর্তি নির্মাণ শৈলীর বিরাট অগ্রগতি ঘটে। এই যুগে এই শিল্প উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত হয়। গোটা দেশ জুড়েই ছিল মূর্তিপূজার রমরমা অবস্থা। শেষ অবধি বৌদ্ধ মতবাদ ও জৈন ধর্ম সাধারণ জনগণের চাহিদার সামনে মস্তক অবনত করতে ও তাদের সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে তাদের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। মূর্তিপূজার এই চরমোৎকর্ষ এবং মূর্তি ও প্রতিকৃতির আধিক্যের পরিমাপ প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (যিনি ৬৩০ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন)-এর বর্ণনা থেকেই করা যাবে যেখানে তিনি রাজা হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৭ খ্রি.) উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

সম্রাট হর্ষবর্ধন কনৌজে ধর্মীয় পণ্ডিতদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। পঞ্চাশ হাত উঁচু স্তম্ভের ওপর গৌতম বুদ্ধের স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি স্থাপন করা হয়। এর চেয়ে ক্ষুদ্রকায় আরেকটি মূর্তির বিরাট ধুমধামের সাথে শোভাযাত্রা বের করা হয় যার মধ্যে সম্রাট হর্ষবর্ধন সকর দেবতার পোশাকে ছত্রদণ্ড বহন করেন এবং তাঁর মিত্র রাজা কামরূপ অধিপতি কুমারা পাখা দুলিয়ে মাছি তাড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন।[২]

---

১. তমদ্দুন-ই হিন্দ পৃ. ৪৪০-৪১

২. হিউয়েন সাঙ-এর সফরনামা।

হিউয়েন সাঙ সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরিবার-পরিজন ও দরবারীদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাদের কেউ ছিল শিব পূজারী , আবার কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। কেউ বা সূর্য দেবতার পূজা করত, কেউ করত বিষ্ণু পূজা। কে কোন্ দেবতা বা দেবীর পূজা করবে, নাকি সবক'টি দেবদেবীর পূজা করবে, এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।[১]

যৌন অরাজকতা

যৌন আবেগ ও যৌনপ্রবণতাকে উস্কানি দানকারী উপাদান ধর্মীয়রূপে যতটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় ততটা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। দেশের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও ধর্মীয় মহলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং সৃষ্টি ও জন্মের কার্যকারণ বিশ্লেষণ, দেবতা ও দেব-দেবীদের সঙ্গম, সহবাস এবং কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এমন সব ঘটনা ও বর্ণনা বিবৃত করেছে যা শুনলে লজ্জায় মাথা নীচু ও কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। বড়ই নিষ্ঠা ও ভক্তিসুলভ আবেগের সাথে উল্লিখিত কাহিনীগুলো পুনরাবৃত্তিকারীর সহজ সরল ধর্মপরায়ণ লোকদের ওপর যে প্রভাব পড়ে তা সহজেই অনুমেয়। তাদের মনের অজান্তেই তাদের স্নায়ু ও আবেগের ওপর এসব বর্ণিত কাহিনীর যে প্রভাব পড়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন বড় দেবতা শিবের লিঙ্গের পূজা হতো এবং শিশু-যুবা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এতে অংশ গ্রহণ করত। ডক্টর গুস্তাভ-লীবন-এর গুরুত্ব ও এরই সাথে ভারতবাসীদের এর প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ মূর্তি ও বাহ্যিক প্রতীকের প্রতি হিন্দুদের আকর্ষণ ও অনুরাগ সীমাহীন। তাদের ধর্ম যা-ই হোক, তার অনুষ্ঠানাদি তারা অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাদের মন্দিরগুলো আরাধ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এসবের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলো 'লিঙ্গ' ও 'যোনী' যা প্রজননেরই ইঙ্গিতবহ। অশোক স্তম্ভকেও সাধারণ হিন্দুরা লিঙ্গের প্রতীক বলে মনে করে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী শঙ্কু আকৃতির বস্তু মাত্রই তাদের কাছে সম্মানার্হ।[২]

কতক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরুষেরা উলঙ্গ মহিলাদের এবং মহিলারা উলঙ্গ ও নগ্ন পুরুষদের পূজা করত।[৩] মন্দিরের রক্ষী ও পুরোহিতরা ছিল যাবতীয় অনাচার ও অপকর্মের হোতা এবং বহু উপাসনালয় ছিল যৌন অপরাধের আখড়া। রাজপ্রাসাদ ও শাহী দরবারগুলোতে দেদারসে মদ পান চলত এবং পানোন্মত্ত অবস্থায় নৈতিকতার সীমা লংঘিত হতো।

১. হিউয়েন সাঙ-এর সফরনামা; ২. তমদ্দুন-ই হিন্দ, পৃ. ৪৪১;
৩. দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ, পৃ. ৩৪৪।

এরূপ দৈহিক ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয় পূজার পাশাপাশি আত্মহনন, যোগ সাধনা ও তপস্যার ধারাও অব্যাহত ছিল যার মধ্যে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। দেশ ও রাষ্ট্র এই দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝখানে ছিল ভারসাম্যহীন ও দ্যোদুল্যমান। গুটি কয়েক লোক আত্মহনন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় মগ্ন ছিল আর সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয় পূজা ও ভোগবাদী স্রোতধারায় ভেসে চলছিল।

শ্রেণীভেদ প্রথা

পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে এত সুস্পষ্ট শ্রেণী বৈষম্য, পেশা ও জীবনের কর্মের এমনতরো অনড় ও অটল বিভক্তি কমই দেখা গেছে, যেমনটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জাতপাতের ভেদ বৈষম্য এবং একই পেশার যাঁতাকলে বন্দী হবার সূচনা বৈদিক যুগের শেষ দিকে শুরু হয়। আর্যরা তাদের বংশ ও বংশীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে, এদেশে বিজেতা হিসেবে তাদের অবস্থানগত মর্যাদা কায়েম রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রেণীভেদ প্রথা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য জ্ঞান করে। ড. Gustave le Bon -এর ভাষায় ঃ

We have seen that, towards the close of the Vedic Age, occupation had started become more or less hereditary, and the germ of the caste system had been sown. The Vedic Aryans were alive to the need of maintaining the purity of their race by not mixing with the conquered peoples and when they advanced towards the east and subjugated vast populations, this need became still more manifest and the law-givers had to pay due regard to it. The Aryans understood the problems of race well; they had come to realize that if a ruling minority did not take proper care of itself, it was rapidly assimilated with the servile population and deprived of its identity.

"বৈদিক যুগের শেষ দিকে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন পেশা কমবেশি পৈতৃক রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছিল এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল যদিও তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে নি। বৈদিক আর্যদের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা তাদের প্রাচীন বংশধারাকে বিজিত জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং যেই মুহূর্তে এই স্বল্প সংখ্যক বিজেতা পূর্ব দিকে অগ্রসর হলো এবং তারা এদেশীয় জাতিগোষ্ঠীর এক বিরাট দলকে পরাভূত করল তখন এর প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেল এবং বিধায়কদের এর প্রতি লক্ষ্য রাখা

অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। বংশধারার সমস্যা আর্যরা বেশ ভাল বুঝেছিল। তারা আগেভাগেই জেনেছিল যে, যদি স্বল্প সংখ্যক বিজেতা কোন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করে তবে তারা যথাসত্বর বিজিত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হারিয়ে যায় এবং তাদের নাম-নিশানাও আর অবশিষ্ট থাকে না।"[১]

কিন্তু একে একটি সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিধানের রূপ দানের কৃতিত্ব অবশ্যই মনুর। মনুজী যীশু খ্রিস্টের জন্মের তিন শ' বছর আগে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার উন্নতির চরম উৎকর্ষের যুগে ভারতীয় সমাজের জন্য এই বিধান প্রণয়ন করেন এবং দেশের তাবৎ জনগণ একে একবাক্যে গ্রহণ করে। সত্বরই এই বিধান দেশীয় আইন ও ধর্মীয় সংবিধানের মর্যাদা লাভ করে। এটাই সেই বিধান যাকে আমরা আজ 'মনুসংহিতা' নামে জানি।

মনু সংহিতায় চারটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছেঃ (১) ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণী; (২) ক্ষত্রিয় অর্থাৎ লড়াকু বা যোদ্ধা শ্রেণী; (৩) বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে নিয়োজিত শ্রেণী এবং (৪) শূদ্র, যাদের নির্দিষ্ট কোন পেশা ছিল না, অপর তিন শ্রেণীর সেবা করাই ছিল তাদের কাজ। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"পরম স্রষ্টা পৃথিবীটাকে মঙ্গলার্থে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

"এই পৃথিবীর হেফাজতের জন্য তিনি এদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন।"[৩]

"ব্রাহ্মণের জন্য বেদের শিক্ষাদান এবং স্বয়ং নিজেদের ও অন্যের জন্য দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্য দেওয়া এবং অর্ঘ্য দেওয়া-নেওয়ার কর্তব্য নিরূপণ করেন।"[৪]

ক্ষত্রিয়দেরকে তিনি বিধান দেন, "তারা সৃষ্টিকুলকে রক্ষা করবে, অর্ঘ প্রদান করবে, বেদ পড়বে, কামনা-বাসনার শিকার হবে না।"[৫]

বৈশ্যদের ক্ষেত্রে তিনি এই বিধান দেন, "তারা গবাদি পশুর সেবা করবে, অর্ঘ্য দেবে, ভেট প্রদান করবে, বেদ পাঠ করবে, ব্যবসায়িক লেনদেন ও কৃষিকাজ করবে।"[৬]

"শূদ্রদের জন্য পরম স্রষ্টা কেবল একটাই দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন আর তা হলো তারা উপরোল্লিখিত তিন শ্রেণীর সেবা করবে।"[৭]

---

১. তমদ্দুনে হিন্দ পৃ. ৩১১;
২-৫. মনু সংহিতা, ১ম অধ্যায়, পৃ. যথাক্রমে ৩১, ৮৭, ৮৮, ৮৯;
৬-৭. মনু সংহিতা, ১ম অধ্যায়, পৃ. যথাক্রমে ৯০, ৯১।

এই সংহিতা তথা শাস্ত্রীয় বিধান ব্রাহ্মণদেরকে অপরাপর শ্রেণী সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় এতটা শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা দান করেছিল যে, তারা দেবতাদের সমপর্যায়ে উপনীত হয়। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"যখন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন সে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সৃষ্টি। তারা সমগ্র সৃষ্টিজগতের সম্রাট। আর তাদের কাজ হলো শাস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ।"[১]

"এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ব্রাহ্মণদের সম্পদ। যেহেতু সৃষ্টি জগতের মধ্যে তারাই বড় তাই সব কিছুই তাদের।"[২]

"ব্রাহ্মণ প্রয়োজনবোধে তার শূদ্র দাসদের সহায়-সম্পদ যবর দখল করতে পারবে। এরূপ ছিনিয়ে নেবার জন্য তার ওপর কোন অপরাধ বর্তাবে না। কেননা দাস সহায়-সম্পদের মালিক হতে পারে না। তার সকল সহায়-সম্পদ তার মালিকের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।"[৩]

"ঋগ্বেদ যে ব্রাহ্মণের মুখস্থ সে সকল পাপ থেকে মুক্ত চাই সে ত্রিভুবনের সর্বনাশ সাধন করুক, চাই সে কারোর খাবারই কেড়ে খাক।"[৪]

"রাজার যতই প্রয়োজন দেখা দিক, এমন কি তিনি যদি মরণদশায়ও পতিত হন তবুও কোন ব্রাহ্মণ থেকে তার রাজস্ব গ্রহণ সমীচীন নয়। তেমনি রাষ্ট্রের কোন ব্রাহ্মণকে তিনি ক্ষুৎ পিপাসায় মরতে দেবেন না।"[৫]

"মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণের শাস্তি হবে কেবল মস্তক মুণ্ডন। একই অপরাধ অন্য কেউ করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।"[৬]

উক্ত বিধানে ক্ষত্রিয় যদিও বৈশ্য ও শূদ্রের তুলনায় উন্নততর শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু ব্রাহ্মণের মুকাবিলায় তার অবস্থান নীচে।"

মনু বলেন ঃ

"দশ বছর বয়স্ক একজন ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে শত বছরের ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের ন্যায়। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বালকের অবস্থান হবে পিতার।[৭]

হতভাগ্য শূদ্র

অবশিষ্ট রইল অস্পৃশ্য শূদ্র। ভারতীয় সমাজে তারা ছিল এই নাগরিক ও ধর্মীয় বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে পশু থেকে নিম্নস্তরের, এমন কি কুকুরের চেয়েও ঘৃণিত। মনু সংহিতায় বলা হয়েছেঃ

১-৭. মনুসংহিতা, যথাক্রমে ৯৯,১০০, সপ্তম অধ্যায় ৪১৭, ৯ম অধ্যায় ২৬২, ৮ম অধ্যায় ১৩৩, ৭ম অধ্যায় ৩৭৯; ২য় অধ্যায়, ১৩৫ পৃ.।

"ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের জন্য খুবই প্রশংসাযোগ্য বিষয়। এ ছাড়া আর কোন কিছুর বিনিময়েই সে অন্য কোন পুরস্কার পেতে পারে না।"[১]

"শূদ্র যদি সুযোগ পায় তবুও তার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা উচিত নয়। কেননা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সে ব্রাহ্মণের মনে দুঃখ দেয়।"[২]

"যদি কোন শূদ্র উচ্চ বর্ণের কারোর ওপর হাত ওঠায় কিংবা মারার জন্য লাঠি তোলে, তবে শাস্তি হিসেবে তার হাত কেটে ফেলা হবে। আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যদি কাউকে লাথি মারে তাহলে তার পা কেটে ফেলা হবে।"[৩]

"শূদ্র যদি উচ্চ বর্ণের কোন লোকের সঙ্গে একই জায়গায় বসতে চায় তা হলে রাজার উচিত তার নিতম্বে গরম লোহার ছেঁকা দেওয়া এবং তাকে দেশান্তরিত করা।"[৪]

"যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে কিংবা গালি দেয় তবে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। আর যদি সে এই দাবি করে যে, সে তাকে (ব্রাহ্মণকে) পড়াতে পারে তবে তাকে ফুটন্ত তেল পান করতে দেওয়া হবে।"[৫]

"কুকুর, বিড়াল, ব্যাঙ, টিকটিকি, কাক, পেঁচক মারলে যে প্রায়শ্চিত্ত একজন শূদ্রকে মারলেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত।"[৬]

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

ব্রাহ্মনী যুগে নারীর সেই মর্যাদা ছিল না যা বৈদিক যুগে ছিল। মনুর সংহিতায় (গুস্তাভ-লী বন-এর মতে) নারী সর্বদাই দুর্বল ও অবিশ্বাসী বিবেচিত হয়েছে এবং নারী ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে।[৭]

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী জীবন্মৃতের ন্যায় হয়ে যেত এবং জীবিত থাকতেই মৃতের দশায় উপনীত হতো। সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার ভাগ্যে জুটত তীব্র ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা। বিধবা হবার পর তাকে তার মৃত স্বামীর ঘরের চাকরানী এবং দেবরের সেবা দাসী হয়ে থাকতে হতো। অধিকাংশ বিধবাকে স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে হতো। ড. গুস্তাভ লী বন বলেন, "বিধবাদের তাদের স্বামীর লাশের সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে যেতে হবে, এ রকম বিধান মনুসংহিতায় নেই। মনে হয় এই প্রথার (সতীদাহ প্রথা) ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। কেননা গ্রীক ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ এর উল্লেখ করেছেন।"[৮]

১. মনু সংহিতা, ১০ম অধ্যায় ১২৯:
২-৬. মনু সংহিতা, ৭ম অধ্যায় ২৮০, ৭ম অধ্যায় ২৮১; প্রাগুক্ত।
৭. তমদ্দুন-ই হিন্দ, ২৩৬ পৃ: । ৮. প্রাগুক্ত, ২৩৮ পৃ.।

মোটকথা, এই সবুজ শ্যামল দেশ যা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল, সত্যিকার আসমানী ধর্মের শিক্ষামালা থেকে সুদীর্ঘ কাল থেকে বঞ্চিত থাকায় এবং ধর্মের নির্ভরযোগ্য উৎসের বিলুপ্তির দরুন কষ্ট-কল্পনা ও বিকৃতির শিকার এবং রসম-রেওয়াজ ও প্রথা পদ্ধতির পূজারীতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়কার পৃথিবী তো অজ্ঞতা, মূর্খতা, কল্পনা-পূজা, নীচু স্তরের মূর্তিপূজা, প্রবৃত্তি পূজা ও শ্রেণীগত বৈষম্যের ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী এবং পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে নিজেই ছিল অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার মাঝে নিমজ্জিত।

আরব

জাহিলী যুগে আরব কিছু কিছু আপন প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত যোগ্যতা এবং কতকগুলো গুণে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। ভাষার অলংকার, বাক-চাতুর্যে ও ছন্দ প্রকরণে তাদের কোন জুড়ি ছিল না। স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধকে তারা নিজেদের জীবনের চাইতেও বেশি ভালবাসত। শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শনে এবং অশ্বারোহণেও তাদের কোন বিকল্প ছিল না। তারা বিশ্বাসে দৃঢ়, স্পষ্টভাষী, সাহসী, তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তির অধিকারী, সাম্যবাদী, লৌকিকতামুক্ত ও কষ্ট সহিষ্ণু, প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অনড় এবং বিশ্বস্ততা রক্ষায় ও আমানতদারীতে ছিল প্রবাদতুল্য।

কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তাঁদের শিক্ষামালা থেকে দূরে অবস্থান, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই উপদ্বীপে আবদ্ধ থাকা এবং বাপ-দাদার ধর্ম ও জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রথা-পদ্ধতি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকার দরুন তারা ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে খুবই নিচে নেমে গিয়েছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তারা অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল। প্রকাশ্য মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল তারা এবং এ ব্যাপারে তারাই ছিল নাটের গুরু। নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি তাদের সমাজকে ঘুণের ন্যায় কুরে কুরে খাচ্ছিল। মোটকথা, ধর্মাশ্রিত জীবনের অধিকাংশ সৌন্দর্য থেকেই তারা ছিল মাহরূম এবং জাহিলী জীবনের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য ও দোষত্রুটিতে নিমজ্জিত।

ইসলাম পূর্ব (জাহিলী) যুগের মূর্তি

অজ্ঞতা ও মূর্খতার উন্নতির সাথে সাথে গায়রুল্লাহ্‌র পূজার আকীদাও ব্যাপক ও জনপ্রিয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহদানিয়াত (একত্ববাদ) ও রবূবিয়াত (পালনবাদ)-এর ধারণা দুর্বল এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়, এমন কি ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতিগোষ্ঠী মূর্তি ও পুতুলের (যেগুলো কোন এককালে সুপারিশকারী ও মাধ্যম কিংবা মনোযোগের কেন্দ্র বানাবার জন্য অবলম্বন করা

হয়েছিল) পরিষ্কার ও খোলাখুলি পূজায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা থেকে (যাঁকে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও সকল প্রতিপালনের প্রতিপালক হিসেবে তখনও স্বীকার করা হতো[১]) কার্যত ও অন্তর-মন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে অন্যান্য উপাস্য দেবদেবী ও মূর্তির সঙ্গে কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশের পন্থা ও আমলসমূহ (সিজদা, কুরবানী, শপথ, দো'আ ও সাহায্য প্রার্থনা) সেগুলোর সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে প্রকাশ্য মূর্তিপূজা, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও সুস্পষ্ট শিরক-এর রাজত্ব চলছিল।[২]

আরবের প্রতিটি গোত্রে, প্রতিটি শহরে ও প্রতি জনপদের একটি বিশেষ মূর্তি ছিল, বরং বলা যায় প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব মূর্তি ছিল। ঐতিহাসিক কালবী বলেন, "মক্কা মুকাররমার প্রতিটি ঘরেই তাদের একটি নিজস্ব মূর্তি ছিল। মক্কায় কেউ ভ্রমণের ইচ্ছা করলে রওয়ানা হবার সময় ঘরে তার সর্বশেষ কাজ হতো বরকত হাসিলের জন্য গৃহে রক্ষিত মূর্তি স্পর্শ করা এবং সফর থেকে ঘরে ফিরেই তার সর্বপ্রথম কাজ হতো বরকত হিসেবে মূর্তির পা ভক্তিভরে স্পর্শ করা।"[৩] মূর্তি সম্পর্কে খুবই বাড়াবাড়ি করা হতো এবং এর ভেতর তারা ডুবে থাকত। কেউ বানাত মূর্তি আর কেউ বানাত মূর্তির ঘর। আর যে এর কোনটাই বানাতে পারত না, সে হারাম শরীফের সামনে একটি পাথর গেঁড়ে দিত অথবা হারাম শরীফ ভিন্ন অন্য কোথাও যেখানে সে ভাল মনে করত পাথর পুঁতে তার চারপাশে এমন শান-শওকতের সঙ্গে তওয়াফ করত যেরূপ শান-শওকতের সঙ্গে বায়তুল্লাহ্র চারপাশে তওয়াফ করা হয়। এই সব পাথরকে তারা 'আনসাব' বলত।[৪] খোদ কা'বা শরীফের ভেতর (যেই কা'বা শরীফকে কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের নিমিত্ত নির্মাণ করা হয়েছিল) এবং এর প্রাঙ্গণে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল।[৫] মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা করতে করতে এরা এত দূর পৌঁছে গিয়েছিল যে, পাথর জাতীয় কিছু একটা পেলেই তারা পূজা শুরু করে দিত।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আবূ রাজা' আল-উতারেদী থেকে বর্ণনা করেন, "আমরা পাথর পূজা করতাম। যদি ঐ পাথরের চেয়ে ভাল ও

---

১. ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولنّ الله যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয় আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে তবে অবধারিতভাবেই তারা বলবে, 'আল্লাহ'।

২. জাহিলী যুগের আরবদের আকীদা-বিশ্বাস ও শেরেকী আকীদার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সিরীয় মনীষী মুহাম্মদ ইযযত দরূযাহ্ লিখিত وبيئة النبى صلى الله عليه وسلم من القران 'কুরআনের আলোকে নবী করীম (সা)-এর দেশ ও পরিবেশ' গ্রন্থ দেখুন।

৩. কিতাবুল আসনাম, ৩৩পৃ.। ৪. প্রাগুক্ত।

৫. সহীহ বুখারী (র), কিতাবুল মাগাযী, মক্কা বিজয় শীর্ষক অধ্যায়।

উন্নত মানের পাথর পাওয়া যেত তাহলে পুরনো পাথরটাকে ছুঁড়ে ফেলা হতো এবং নতুনটাকে গ্রহণ করা হতো। আর যদি পাথর না পাওয়া যেত তাহলে মাটির একটা ঢিবি বানানো হতো এবং সেখানে ছাগল এনে দুধ দোহন করা হতো। এরপর তার তওয়াফ করা হতো।"[১] ইবনুল কালবী বলেন যে, কোন লোক ভ্রমণকালে কোন নতুন জায়গায় অবতরণ করলে সেখান থেকে চারটি পাথর উঠিয়ে আনত। এরপর তার ভেতর থেকে সর্বোত্তমটাকে 'উপাস্য দেবতা' হিসেবে গ্রহণ করা হতো আর বাকি তিনটাকে হাঁড়ি বসাবার জন্য রাখা হতো। এরপর সেখান থেকে প্রস্থানের সময় ওগুলো ওখানেই ফেলে যেত।[২]

উপাস্য দেবদেবীর আধিক্য

সর্বকালে সর্বযুগে ও সরদেশে কাফির-মুশরিকদের যেই অবস্থা আরবদের অবস্থাও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের উপাস্য দেব দেবী ছিল বহু। এসবের ভেতর ফেরেশতা, জিন্ন ও নক্ষত্রপুঞ্জ সবই শামিল ছিল। ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্র কন্যা সন্তান। এজন্য তারা ফেরেশতাদের নিকট সুপারিশ কামনা করত, তাদের পূজা করত এবং তাদেরকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করত। জিনদেরকে তারা আল্লাহ্র শরীক জ্ঞান করত, তাদের শক্তি ও প্রভাবের ব্যাপারে বিশ্বাস করত এবং তাদের পূজা করত।[৩]

ঐতিহাসিক কালবী বর্ণনা করেন যে, খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা ছিল বনূ মলীহ। তারা জিনদের পূজা করত।[৪] সা'এদ বর্ণনা করেন যে, হিময়ার গোত্র সূর্যের পূজা করত। কিনানা গোত্র চাঁদের পূজারী ছিল। বনূ তামীম ওয়াবরানের, লাখ্ম ও জুযাম বৃহস্পতির, তাঈ গোত্র সুহায়ল-এর, বনূ কায়স শে'রা নক্ষত্রের এবং বনূ আসাদ বুধ গ্রহের পূজা করত।[৫]

নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি

তাদের ভেতর বহু নৈতিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল এবং তার কারণও সুস্পষ্ট। তাদের মদ পান এতই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে, এর আলোচনা তাদের সাহিত্য ও কাব্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বসে ছিল। আরবী ভাষায় মদের যেই বিপুল সংখ্যক নাম পাওয়া যায় এবং এসব নামের ভেতর যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা থেকেই এর গ্রহণযোগ্যতা ও

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বনী হানীফা প্রতিনিধি দল শীর্ষক অধ্যায়।

২. কিতাবুল আসনাম; ৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪। ৪. প্রাগুক্ত;৩৪ পৃ:।

৫. তাবাকাতু'ল-উমাম, ৪৩০ পৃ.।

ব্যাপকতার পরিমাপ করা যায়।[১] মদের দোকান ছিল প্রকাশ্য রাস্তার ওপর এবং চেনার সুবিধার্থে এসব দোকানের ওপর পতাকা উড়ত।[২] জাহিলী যুগে জুয়া ছিল গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় এবং এতে অংশ গ্রহণ না করা ছিল কাপুরুষতা ও নিস্তেজতার পরিচায়ক।[৩] প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত কাতাদা বলেন যে, জাহিলী যুগে একজন তার ঘরবাড়ি জুয়ার বাজি হিসেবে ধরত। এরপর জুয়ায় তা হারিয়ে ব্যথা-ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তা' দেখত। এর ফলে ঘৃণা ও শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠত এবং পরিণতি যুদ্ধ-বিগ্রহে গিয়ে গড়াত।[৪]

হেজাযের আরব অধিবাসী ও য়াহূদীরা সূদী লেনদেন করত এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের কারবার চালাত। এ ব্যাপারে বড়ই নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার অভিব্যক্তি ঘটত।[৫] ব্যভিচারকে খুব একটা দূষণীয় মনে করা হতো না এবং আরবদের জীবনে এ ধরনের ঘটনার অভাব ছিল না। এরও আবার রকমারি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এজন্য পেশাদারী মহিলাও ছিল এবং স্বতন্ত্র বেশ্যালয় ছিল। শুড়িখানাগুলোতেও এর ব্যবস্থা ছিল।[৬]

নারীর মর্যাদা

জাহিলী সমাজে সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ছিল একটি সাধারণ ও বৈধ ব্যাপার। তাদের অধিকারকে পদদলিত করা হতো। তাদের সম্পদকে পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ মনে করত। ওয়ারিশ হিসেবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তারা কোন অংশ পেত না। স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে পছন্দ মাফিক দ্বিতীয় বিয়েরও অধিকার ছিল না।[৭] অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ও জীব-জন্তুর মতই নারীও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত ও হস্তান্তরিত হতো[৮]

পুরুষ তো তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিত, কিন্তু মহিলারা তাদের অধিকার নিতে পারত না। এমন অনেক খাদ্যদ্রব্য ছিল যেগুলো কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, মহিলারা তা খেতে পেতো না।[৯]

পুরুষরা যত সংখ্যক ইচ্ছে নারীকে বিয়ে করতে পারত। কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদের জীবন্ত প্রোথিত করারও রেওয়াজ ছিল। হায়ছাম ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন যে, জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা আরবের সকল গোত্রেই প্রচলিত ছিল। একজন একে কার্যকর করত আর

১. দ্র. কিতাবুল মুখাস্‌সাস (ইবনে সায়্যিদা),আল-খুমুর ১১শ খণ্ড, ৭২, ৮২। ২. সাব'আ মুআল্লাকা। ৩. দীওয়ান আল-হামাসা, হিজর ইবন খালিদের কাসীদা। ৪. তফসীরে তাবারী দ্র.انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء -এর তফসীর। ৫. তফসীরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৫৯-৬৯। ৬. দ্র.আল-ইকদুল ফারীদ. কিতাব আখবারু যিয়াদ (ইব্‌ন আব্‌দি রাব্বিহি)। ৭. সূরা বাকারার ২৩২ আয়াত। ৮. সূরা নিসা, ১৯, আয়াত। ৯. সূরা আল-আনআম, ১৪০ আয়াত।

দশজন ছেড়ে দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল।[১] কেউ লোকলজ্জা ও অপমানের কারণে, কেউবা খরচ জোগাতে অসমর্থতা ও দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করত। আরবের কোন কোন শরীফ ও নেতৃস্থানীয় লোক এ সময় এ ধরনের শিশুদেরকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করত।[২] সা'সা'আ ইবনে নাজিয়া বর্ণনা করেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত আমি জীবন্ত প্রোথিত হতে যাচ্ছে, এ ধরনের তিন শ' কন্যা সন্তানের জীবন অর্থের বিনিময়ে বাঁচিয়ে ছিলাম।[৩] কোন কোন সময় কোন সফর কিংবা কাজে জড়িয়ে পড়ায় সময়াভাবে কন্যা বড় হয়ে গেলে এবং প্রোথিত করার অবকাশ না পেলে গোঁয়ার পিতা ধোঁকা দিয়ে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম গ্রহণের পর অনেকে তাদের বিগত জীবনের এ ধরনের বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[৪]

অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও খান্দানী বৈশিষ্ট্য

অন্ধ গোষ্ঠীপ্রীতি আরবদের মাঝে কঠোরভাবে চলে আসছিল। এই গোষ্ঠীপ্রীতির বুনিয়াদ ছিল জাহিলী মেযাজ— যার মর্মকথা এই বিখ্যাত বাক্য থেকে প্রকাশ পায় ঃ انصر اخاك ظالما اومظلوما 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম।' অনন্তর তারা তাদের ভাই ও মিত্রকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করাকে জরুরী বিবেচনা করত, চাই তা তারা ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক অথবা অন্যায় ও অসত্যের ওপর।

আরব সমাজ জীবন বিভিন্ন শ্রেণী ও পৃথক পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বংশ ও খান্দানের সমষ্টি ছিল। এক খান্দান অপর খান্দানের তুলনায় নিজেদেরকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভাবত। কোন কোন খান্দান অন্য কোন খান্দান কিংবা আম্ জনতার সাথে বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা পসন্দ করত না, এমন কি হজ্জের কিছু কিছু ক্রিয়াকর্মে কুরায়শরা সাধারণ হাজীদের থেকে পৃথক থাকত এবং নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখত। সাধারণ হজ্জযাত্রীদের সঙ্গে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করাকে তারা লজ্জার বিষয় বলে মনে করত। আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা আগে ভাগে যেত।[৫] একটা শ্রেণী ছিল যারা জন্মগতভাবে প্রভু। একটা শ্রেণী ছিল নীচু স্তরের যাদের বেগার খাটানো হতো এবং তাদের দিয়ে (বিনা বেতনে ও বিনা পারিশ্রমিকে) কাজ করানো হতো। আর কিছু লোক ছিল সাধারণ পর্যায়ের আর কিছু লোক বাজার-ঘাটের।

১. ময়দানী; ২. দ্র. বুলূগুল আরব ফী আহওয়ালিল আরব, আল্লামা আলূসীকৃত। ৩. কিতাবুল আগানী; ৪. দ্র. সুনান দারমী, ১ম খণ্ড, পৃ৮। ৫. সূরা আল-বাকারা, ১৯৯ আয়াত।

যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় স্বভাব

আরবরা প্রকৃতিগতভাবেই যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাদের মরুচারী অসংস্কৃত জীবনের এটাই ছিল চাহিদা ও দাবি। যুদ্ধ তাদের জীবনের একটি অনিবার্য প্রয়োজনের চাইতেও বেশি ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্তবিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছিল যা ছাড়া তাদের বেঁচে থাকাটাই ছিল কঠিন। তাদেরই জনৈক কবি গর্বভরে বলেন ঃ

واحيانا على بكر اخينا – اذا مالم نجد الا اخانا –

'আমরা যদি প্রতিপক্ষ হিসেবে কোন কবিলা না পাই তাহলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য আমরা আমাদের মিত্র গোত্রের ওপরই অগত্যা ঝাঁপিয়ে পড়ি।'[১]

একজন আরব কবি এভাবে তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেন যে, আমার ঘোড়া আরোহণের উপযুক্ত হলে আল্লাহ তা'আলা যেন যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেন যাতে করে আমি আমার ঘোড়ার ও তরবারির নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাই।[২]

যুদ্ধ ও রক্তপাত তাদের কাছে ছিল নেহাত মামুলী ব্যাপার। যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর জন্য মামুলী কোন ঘটনাই যথেষ্ট ছিল। ওয়াইল-এর বংশধর বকর ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বছর যাবত যুদ্ধ চলেছিল যেখানে পানির মত বেদেরেগ রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। মুহালহিল নামক জনৈক আরব সর্দার উল্লিখিত যুদ্ধের চিত্র এভাবে এঁকেছেনঃ

"দু'টো খান্দানই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মা হারিয়েছে তার সন্তান আর সন্তান হয়েছে পিতৃহীন ইয়াতীম। চোখের পানি শুকায় না, লাশও আর দাফন করা হয় না।"[৩] গোটা আরব উপদ্বীপ ছিল যেন শিকারীর পাতা জাল। কেউ জানত না যে, কোথায় তাকে লুট করা হবে। আর কেউ বলতে পারত না কখন তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হবে। কাফেলার মাঝে থেকে লোক ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেওয়া হতো, এমন কি তৎকালীন সুবিশাল রাষ্ট্রসমূহেরও তাদের কাফেলা ও দূতের নিরাপত্তার জন্য মজবুত চৌকি পাহারা এবং গোত্রের প্রধানদের জামানতের প্রয়োজন পড়ত।[৪]

একটা সাধারণ পর্যালোচনা

R.V.C. Bodley নামক ইংরেজ জীবন-চরিতকার তাঁর The Messenger নামক গ্রন্থে ইসলামের আবির্ভাবের সময় তৎকালীন পৃথিবীর সাধারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে সে সময়কার উল্লেখযোগ্য দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর নিম্নোক্ত রূপ আলোচনা করেছেন ঃ

১. দীওয়ানে হামাসা; ২. দীওয়ানে হামাসা। ৩. দ্র. আয়্যামু'ল-আরব নামক পুস্তক।
৪. দ্র. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।

"The Arabs did not command any respect in the sixth century world. As a matter of fact, no one counted very much. It was a moribund period when the great empires of Eastern Europe and Western Asia had already been destroyed or were at the end of their imperial careers.

"It was a world still dazed by the eloquence of Greece, by the grandeur of Persia, by the majesty of Rome, with nothing yet to take their places, not even a religion.

"The Jews were wandering all over the world, with no central guidance. They were tolerated or persecuted according to circumstances. They had no country to call their own, and their future was as uncertain as it is today.

"Outside the sphere of influence of Pope Gregory the Great, the Christians were propounding all kinds of complicated interpretations of their once simple creed and were busy cutting one another's throat in the process.

"In Persia, a last flicker of empire-building remained. Khusrau II was extending the frontiers of his domain. By inflicting defeat on Rome he had already occupied Cappadocia, Egypt and Syria. In 620 A.C. (after Christ), when Muhammad was about to emerge as a guide for humanity, he had sacked Jerusalem and stolen the Holy Cross and restored the might and grandeur of Darius I. It looked almost like a new lease of life for the splendour of the Middle East. Yet the Byzantine Romans still had a little of their old vitality. When Khusrau brought his army to the walls of Constantinople, they made a final effort to survive.

"Further away in the east, the march of events was leaving few landmarks. India still consisted of many unimportant petty states which struggled mutually for political and military supremacy.

"The Chinese, as usual, were fighting among themselves. The Sui dynasty came into power to be replaced by the Tang which ruled for three centuries.

"In Japan, an Empress occupied the throne for the first time. Buddhism was beginning to take root and to influence Japanese ideas and ideals.

"Europe was gradually merging into the Frankish Empire, which would eventually comprise France, Northern Italy, most

of the countries east of the Rhine as far as the present Russo-Polish border. Clovis was dead and Dagobert, the last great Merovingian ruler, was soon to be crowned.

"Spain and England were unimportant petty States.

"Spain was under the control of Visigoths, who had lately been driven out of France which they had occupied as far in the north as Loire. They were persecuting the Jews, who would, consequently, do much to facilitate the Muslim invasion which was to follow a century later.

"The British Isles were divided into independent principalities. One hundred and fifty years had passed since the departure of the Romans, who had been replaced by an influx of Nordic people. England herself was made up of seven separate kingdoms."

"প্রাচীন ঐতিহ্য সত্ত্বেও ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতকে তখনকার বিশ্বে আরবদের কোন গুরুত্ব ছিল না। আসলে তখন কারুরই কোন গুরুত্ব ছিল না। এটা ছিল এক মরণোন্মুখ মুহূর্ত যখন পূর্ব য়ূরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার দুই বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা মুমূর্ষু প্রায়। এ ছিল এমন এক জগত যা এখনও গ্রীসের বাকচাতুর্য, ইরানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রোমের জাঁকজমক ও দাপটে বিস্ময়াভিভূত ছিল এবং এমন কোন বিষয় বা বস্তু কিংবা এমন কোন ধর্মও ছিল না যা তাদের ভেতর কোন একটির স্থান দখল করতে পারত।

"য়াহূদীরা সারা পৃথিবীতেই মার খেয়ে ও গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল। তাদের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। অবস্থা মাফিক তাদের বরদাশ্‌ত করা হতো কিংবা নির্যাতন-নিপীড়ন করা হতো। কোন দেশই তাদের একান্তভাবে নিজেদের ছিল না এবং তাদের ভবিষ্যতও তেমনি অনিশ্চিত ছিল যেমনটি আজ।

"মহামতি পোপ গ্রেগরী (Gregory the Great)-র প্রভাব বহির্ভূত এলাকার খ্রিস্টানরা নিজেদের সহজ সরল ধর্মবিশ্বাসের সর্বপ্রকার জটিল অর্থ অন্বেষণ এবং এ নিয়ে একে অন্যের গলায় ছুরি চালাতে ব্যস্ত ছিল।

"ইরানে সামাজ্য নির্মাণের কেবল একটি আলোক-রশ্মি থেকে গিয়েছিল, দ্বিতীয় খসরূ তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে ও সীমা সম্প্রসারণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে কাপাডোসিয়া, মিসর ও সিরিয়া দখল করেন। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে (যখন মুহাম্মদ সা. নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন) বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে পবিত্র ক্রুশ কাষ্ঠ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সম্রাট ১ম দারিউসের শান-শওকত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মনে হচ্ছিল যেন মধ্যপ্রাচ্যের শৌর্যবীর্য জীবনের এক নতুন কিস্তি পেয়েছে, কিন্তু কেবল এটাই ছিল না। বায়যানটাইন রোমকরা তখনও নিজেদের অতীত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেনি। পারস্য সম্রাট খসরূ যখন তার সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের পাদদেশে এনে দাঁড় করান তখন তারা তাদের শেষ প্রয়াস চালায়।

"দূর প্রাচ্যে উল্লেখযোগ্য বা রেখাপাত করার মত তেমন কিছু ঘটেনি। ভারতবর্ষ তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন কতকগুলো দেশীয় রাজ্যের সমষ্টি যারা রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

"চীনারা ছিল তাদের চিরাচরিত পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত। সুঈ বংশ ক্ষমতায় আসল এবং গেল এবং তাদের স্থান দখল করল তাঙ রাজ বংশ যারা তিন শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

"জাপানে প্রথমবারের মত একজন মহিলা সিংহাসনে বসেন। বৌদ্ধ মতবাদ আসন গেড়ে বসতে শুরু করেছিল এবং জাপানী ধ্যান-ধারণা ও লক্ষ্যের ওপর প্রভাব ফেলে চলেছিল।

"স্পেন ও ইংল্যান্ড ছিল গুরুত্বহীন ক্ষুদ্র দেশ। স্পেন ভিসিগথদের শাসনাধীন ছিল যাদের কিছু কাল পূর্বেই ফ্রান্স থেকে, যার ওপর তারা loire পর্যন্ত দখল কায়েম করে রেখেছিল, বের করে দেওয়া হয়েছিল। তারা য়াহূদীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল যা এক শ' বছর পরের মুসলিম আক্রমণের রাস্তাকে সুগম করছিল।

"বৃটেন উপদ্বীপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রোমকদের বিদায়ের দেড় শ' বছর অতিক্রান্ত হবার পর নরডিক (Nordic) জাতি তাদের স্থান দখল করে। খোদ ইংল্যান্ড সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সমষ্টি ছিল।"[১]

জাহিলী যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসলামপূর্ব যুগের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করবার পর এর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সমীচীন মনে করছি এজন্য যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও অবনতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেই যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও নিয়ম-বিধির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং তা জাতীয় জীবনের বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপাদানও বটে।

১. The Messenger: The Life of Muhammad, P. 18-19।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র

ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগটি ছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগ। এই রাজতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল নির্দিষ্ট বংশ বা পরিবারভিত্তিক যেমনটি ছিল ইরানে। সেখানে সাসানী পরিবারের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, হুকুমতের ওপর তাদের অধিকার মৌরসী এবং তা খোদায়ী সমর্থনপুষ্ট। সার্বিক প্রয়াসের দ্বারা প্রজা সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারাও নির্বিবাদে তা মেনে নিয়েছিল এবং হুকূমত সম্পর্কে তাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যা কখনই ফাটল ধরত না।

কখনো বা এই রাজতন্ত্র কেবল রাজা-বাদশাহদের মহত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো। চীনারা তাদের সম্রাটকে 'ঈশ্বর-পুত্র বা স্বর্গ-পুত্র' বলত। কেননা তারা বিশ্বাস করত যে, আসমান হল নর আর যমীন হলো নারী। আর এদের উভয়ের মিলনে সৃষ্টিকুলের উদ্ভব ঘটেছে এবং সম্রাট ১ম খাতা হচ্ছেন আসমান ও যমীনের মিলনের প্রথম ফসল। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সমকালীন সম্রাটকে জাতির একক পিতা জ্ঞান করা হতো। সুতরাং তার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার ছিল। লোকে সম্রাটকে বলত, 'আপনিই আমাদের মা-বাপ।' সম্রাট লীয়ান কিংবা তাই সুঙের মৃত্যু হলে চীনের লোকেরা গভীর শোক প্রকাশ করে, এমন কি তারা সীমাতিরিক্ত মাতম করে। কেউ কেউ এজন্যে লৌহ পোশাক পরিধান করে, কেউ কেউ সূঁচের সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আপন চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলে। কেউ বা মস্তক মুণ্ডন করে, কেউ কেউ কফিনে ঠুকে ঠুকে নিজেদের কর্ণদ্বয় রক্তাক্ত করে ফেলে। সার্বভৌম ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতাকে কখনো বা কোন বিশেষ গ্রুপ, দল বা নির্দিষ্ট দেশের অধিকার মনে করা হতো, যেমন রোমান সাম্রাজ্যে মনে করা হতো। সেখানে রোমকরা নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর অন্যদেরকে দাস মনে করত। আর এই বিশ্বাস ছিল তাদের মজ্জাগত। এক্ষেত্রে তাদের অধীনস্থদের অবস্থানগত মর্যাদা ছিল রক্তবাহী শিরা-উপশিরার ন্যায় যেগুলোর মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে। রোমকরা যে কোন আইন ও যে কারুর অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারত এবং যে কোন নাগরিকের সম্মান ও সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে পারত। তারা সর্বপ্রকার জুলুমকেই বৈধ মনে করত। রোমকদের সমবিশ্বাসী ও স্ব-ধর্মী হয়েও এবং রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেও কোন ব্যক্তি কিংবা জাতিগোষ্ঠী রোমকদের জুলুম-নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে পারত না। কোন জাতিগোষ্ঠীর বৈধ বা আইনগত মর্যাদা কিংবা অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল না এবং তাদের এ সুযোগও ছিল না যে, নিজ দেশে

১. চীনের ইতিহাস, জেমস কারকর্ণকৃত।

নিজেদের অপরিহার্য মৌলিক অধিকার থেকে উপকৃত হবে এই সব শাসিত জাতিগোষ্ঠী ও বিজিত দেশের উদাহরণ ছিল সেই উটনীর মত যার ওপর প্রয়োজনের সময় আরোহণ করা হয়, আবার দুধও দোহন করা হয়, কিন্তু ঘাস-পাতা দেওয়া হয় কেবল ততটুকুই যাতে সে কোন রকম শিরদাড়া সোজা রাখতে পারে এবং পালান দুধে ভর্তি থাকে। রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Brifault) রোমক সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলেনঃ

"The intrinsic cause that doomed and condemned the Roman Empire was not any growing corruption, but the corruption, the evil, the inadaptation to fact in its very origin and being. No system of human organization that is false in its very principle, in its very foundation, can save itself by any amount of cleverness and efficiency in the means by which that falsehood is carried out and maintained, by any amount of superficial adjustment and tinkering. It is doomed root and branch as long as the root remains what it was. The Roman Empire was, as we have seen, a device for the enrichment of a small class of people by the exploitation of mankind. That business enterprise was carried out with all honesty, all the fairness and justice compatible with its very nature, and with admirable judgment and ability. But all those virtues could not save the fundamental falsehood, the fundamental wrong from its consequence."

"রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও পতনের কারণ কেবল সেখানকার ক্রমবর্ধমান অন্যায় ও দুর্নীতির সয়লাবই ছিল না, বরং এর মৌলিক কারণ ছিল ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অরাজকতা ও বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া ও উপেক্ষা করার প্রবণতা যা এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও লালন-পালনের পয়লা দিন থেকেই বিদ্যমান ছিল। আর এই খারাবীটা সাম্রাজ্যের ভেতর গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিল। কোন মানব সমাজ ও মনুষ্য দলের বিনির্মাণ যখন এ ধরনের দুর্বল ভিত্তির ওপর করা হয় তখন কেবল মেধা ও কর্মতৎপরতা এর পতন রোধ করতে পারে না। যেহেতু মন্দের ওপরই এই সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ছিল সেজন্য এর অবসান ও অধঃপতনও ছিল অনিবার্য। কেননা আমরা জানি যে, রোমক সাম্রাজ্য কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের মাধ্যম ছিল। প্রজাসাধারণ থেকে অবৈধ স্বার্থ হাসিল এবং তাদের রক্ত চুষে রাজতন্ত্রের প্রতিপালনই ছিল এই হুকূমতের কাজ। নিঃসন্দেহে রোমান সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ইনসাফ, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথেই চলছিল এবং এই

বিষয়টাকে হুকূমতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বলে মনে করা হতো। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, হুকূমত তার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে, অধিকন্ত তার প্রশংসনীয় বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছিল অনন্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এই সব গুণ হুকূমতকে না পারত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আর না পারত বুনিয়াদী গলদগুলোর কঠোর কঠিন পরিণতি থেকে রক্ষা করতে।"[১]

রোমক শাসনাধীন মিসর ও সিরিয়া

ড. আলফ্রেড বাটলার রোমানদের অধীনে মিসর সম্পর্কে বলেন ঃ

"The whole machinery of rule in Egypt was directed to the sole purpose of wringing profit out of the ruled for the benefit of the rulers. There was no idea of governing for the advantage of the governed, of raising people in the social scale, of developing the moral or even the material resources of the country. It was an alien domination founded on force and making little pretence of sympathy with the subject race."

"মিসরে রোমান সরকারের সামনে কেবল একটাই লক্ষ্য ছিল আর তা হলো সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে প্রজাবর্গকে নির্মমভাবে শোষণ করে শাসকবর্গের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সহায়তা করা। প্রজাদের কিভাবে কল্যাণ হবে, তাদের সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য নিশ্চিত হবে, তাদের জীবনমান উন্নত হবে, এ ধরনের কোন চিন্তাই তাদের মনে ঠাঁই পেত না। প্রজাদের চরিত্র উন্নয়ন দূরের কথা, দেশের বস্তুগত উন্নয়ন বা শ্রীবৃদ্ধির চিন্তাও তাদের মাথায় ছিল না। মিসরের বুকে তাদের হুকূমত ছিল সেই বিদেশী হুকূমতের মতোই যারা কেবল নিজেদের বাহুবল ও শক্তির ওপরই নির্ভর করে এবং প্রজাদের প্রতি মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশের আদৌ কোন গরজ তারা বোধ করে না।"[২]

একজন সিরীয় আরব ঐতিহাসিক রোমান শাসনাধীন সিরিয়া সম্পর্কে বলেনঃ

"প্রথম দিকে সিরীয়দের সঙ্গে রোমকদের সম্পর্ক বেশ ভাল ও ইনসাফপূর্ণ ছিল। আচার-আচরণ ছিল উত্তম। যদিও রোমক সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা চলছিল কিন্তু তাদের হুকুমত যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো তখন নিকৃষ্টতম গোলামির রূপ পরিগ্রহ করে এবং তারা তাদের অধীনস্থ প্রজাদের সঙ্গে নিকৃষ্টতম মনিবসুলভ আচরণ করে। রোমকরা সরাসরি সিরিয়াকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত

১. Robert Brifault, The Making of Humanity. p- 159.
২. Arabs conquest of Egypt and the last Thirty years of the Roman Dominion, p-42.

করেনি এবং সিরিয়ার অধিবাসীরাও কখনোই রোমকদের ন্যায় নাগরিক অধিকার পায়নি, আর না তাদের এ ভূখণ্ডটি রোমক সাম্রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। সিরীয়রা সর্বদাই বিদেশী লোকের ন্যায় থেকেছে। সরকারী রাজস্ব আদায় করতে না পেরে অধিকাংশ সময় তারা নিজেদের সন্তান পর্যন্ত বিক্রী করতে বাধ্য হতো। জুলুম-নিপীড়নের কোন সীমা ছিল না। ক্রীতদাস বানাবার ও বেগার শ্রম গ্রহণের সাধারণ রেওয়াজ ছিল। আর এই বেগার শ্রম দ্বারাই রোমক হুকুমত সেই সব প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে যেগুলোকে রোমকদের গৌরবজনক কীর্তি বলে মনে করা হয়ে থাকে।"[১]

"রোমকরা সাত শ' বছর যাবত সিরিয়ায় রাজত্ব করে। তাদের আগমন ঘটতেই দেশের ভেতর অনৈক্য, বিভেদ, আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং হত্যার ধারা শুরু হয়ে যায়। গ্রীকরা ৩৬৯ বছর সিরিয়ায় রাজত্ব করে। এই গোটা শাসনামলে মারাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, প্রজাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চলে এবং গ্রীকদের লোভ-লালসা ও উগ্র কামনা-বাসনার নগ্ন রূপ প্রকাশ পায়। সিরীয়দের ওপর তাদের শাসনামল ছিল নিকৃষ্টতম দুর্বিপাক ও কঠিনতম শাস্তি।"[২]

উল্লিখিত বক্তব্যের সারবত্তা এই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে রোম ও পারস্যের অধীনস্থ দেশগুলো খুবই দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের ভেতর দিয়ে চলছিল এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়েই এসব দেশের প্রাণকেন্দ্র রাজধানীগুলো সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল।

ইরানের রাজস্ব ব্যবস্থা

ইরানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা না ছিল ন্যায়ভিত্তিক আর না ছিল সুসংহত, বরং অধিকাংশ অবস্থায় তা ছিল অসম ও নিপীড়নমূলক। রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের চরিত্র ও মানসিকতা এবং রাষ্ট্রের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মাফিক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটত। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক বলেনঃ রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে তহশীলদাররা আত্মসাৎ ও বলপূর্বক কর আদায় করত। রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় এবং প্রতি বছর এর বিভিন্ন রকম হার নির্ধারিত হওয়ায় বছরের শুরুতে আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া এসব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে রাখাও ছিল কঠিন। ফলে অনেক সময় রাজকোষ অর্থশূন্য থাকা অবস্থায়ই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। কিছু অস্বাভাবিক হারে রাজস্ব ধার্য করা

১. কুর্দআলী, খুতাতু'শ-শাম, ১০১পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ১০৩ পৃ.।

তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ত। আর এর জের গিয়ে পড়ত সব সময় পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশগুলোর ওপর, বিশেষ করে ব্যবিলনের ওপর।[১]

পারসিক সাম্রাজ্যে রাজকোষ ও ব্যক্তিগত সম্পদ

জনগণের কল্যাণার্থে রাজকোষ থেকে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। পারস্য সম্রাটদের সব সময় এই নিয়ম ছিল যতটা সম্ভব রাজকোষে নগদ অর্থ-কড়ি ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সঞ্চিত রাখা।[২] সম্রাট ২য় খসরু ৬০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে তদীয় রাজকোষের অর্থ যখন তেসিফোনে (মাদায়েন-এ) নব নির্মিত অট্টালিকায় স্থানান্তরিত করেন সে সময় এতে রক্ষিত কেবল স্বর্ণের পরিমাণই ছিল ৪৬ কোটি ৮০ লক্ষ মিছকাল অর্থাৎ প্রায় ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাংক স্বর্ণমুদ্রা। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের পরে তার রাজকোষে স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৮০ কোটি মিছকালে।[৩] কেবল তাঁর রাজমুকুটেই ১২০ পাউন্ড (প্রায় দেড় মণ) নিখাদ স্বর্ণ ছিল।[৪]

শ্রেণীভেদ

ইরানের জাতীয় জীবনে সম্পদ ও প্রাচুর্য গুটিকয়েক লোকের ভেতর সীমিত ছিল। হাতেগোণা কয়েকজন ছিল খুবই ধনাঢ্য ও সম্পদশালী। অবশিষ্ট সব লোক ছিল অত্যন্ত দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। ইরানের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের জন্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর শাসনামল প্রবাদ বাক্যের মত। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক তাঁর শাসনামল সম্পর্কে লিখছেন :

"খসরু (নওশেরওয়াঁ)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে অবশ্য প্রজাদের তুলনায় রাজকোষের স্বার্থটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রজাসাধারণ সেই আগের মতই দুঃখ-দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও দুর্দশার মধ্যে জীবনাতিপাত করছিল। বায়যান্টাইন যে দার্শনিকরা পারস্য সম্রাটের দরবারে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এই দৃশ্যে সত্বরই ইরান সম্পর্কে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। একথাও সত্য যে, তারা এত বড় মাপের

১. সাসানী আমলে ইরান, ১৬৩ পৃ. ২. প্রাগুক্ত, ১৬২ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত, ৬১১ পৃ. ৪. প্রাগুক্ত ৬২৭ পৃ. রাজমুকুটটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত এবং যমরুদ, ইয়াকূত ও মণি-মুক্তা খচিত ছিল। সম্রাটের মাথার ওপর ছাদের সঙ্গে স্বর্ণের শেকল সহযোগে লটকে থাকত। স্বর্ণের শেকলটি এত সূক্ষ্ম হত যে, একেবারে সিংহাসনের কাছাকাছি গিয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে তা চোখেই পড়ত না। দর্শক দূর থেকে দেখতে পেত রাজমুকুট সম্রাটের মস্তকেই শোভা পাচ্ছে। আসলে মুকুটটি এত ভারী ছিল যে, কারুর পক্ষেই তা মাথায় ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কেননা এর ওজন ছিল ৯১ ১/২ কিলোগ্রাম (দ্র. সাসানী আমলে ইরান, ৫৩১ পৃ.)।

দার্শনিক ছিলেন না যে, একটি ভিন্ন জাতির আচার-অভ্যাস ও প্রথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবেন এবং যেসব বিষয় একজন দার্শনিক-সম্রাটের সাম্রাজ্যে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন তা তাদের চোখে পড়বে না। যেহেতু জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনায় তাঁদের আগ্রহ ছিল না এবং তাঁদের মানসিকতাও এমন ছিল না যেমনটি এ বিষয়ক একজন পাঠকের হয়ে থাকে। সেহেতু ইরানীদের কিছু কিছু প্রথা, যেমন নিষিদ্ধ মহিলা (আপন কন্যা, বোনদের) বিয়ে করার প্রথা অথবা মৃতদেহগুলোকে সকলে খাওয়ার জন্য উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেবার ধর্মীয় রসম তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। কেবল এসব রসমই ছিল না যার দরুন ইরানে অবস্থান তাঁদের কাছে ভাল লাগেনি, বরং জাতিভেদ প্রথা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে অনতিক্রম্য ব্যবধান ও বিরাজমান দুর্দশা-দুরবস্থা যার ভেতর নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলো জীবন যাপন করছিল এসব মানুষের কাছে অসহনীয় ছিল। এসব দৃশ্য দেখেশুনেই তাঁরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আরও দেখতে পান, সমাজের সবল ও শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে নির্মম ও নির্দয় আচরণ করছে।"[১]

এ অবস্থা কেবল ইরানেই ছিল না। তার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যেও মারাত্মক ধরনের শ্রেণী বৈষম্য বিরাজ করছিল। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন:

"When a social structure visibly threatens to topple down, ruler's try to prevent it from falling by preventing it from moving. The whole Roman society was fixed in a system of castes; no one was to change his avocation, the son must continue in the calling of his father."

"এটাই নিয়ম যে, যখনই কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসোন্মুখ হয় তখন এর চালক তার গতি ও অগ্রসরমানতাকে থামিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পান না। এজন্যই রোমান সমাজ (তাদের পতন যুগে) কঠিন ধরনের নিপীড়নমূলক শ্রেণীভেদের লৌহশৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে পড়েছিল। সমাজের কারোর এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তার পেশা পাল্টাবে। সন্তানের জন্য তার পৈতৃক পেশা অবলম্বন করা ছিল বাধ্যতামূলক।"[২]

উভয় সাম্রাজ্যে বড় বড় পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শাসক মহলের সাথে তাদেরই দহরম মহরম ছিল।

১. সাসানী আমলে ইরান, অগাথিয়াস-এর বরাতে, ৩০-৩৭ পৃ.।২. The Making of Humanity. p. 160.

ইরানের কৃষককুল

নিত্য নতুন করভারে জনগণের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। বহু কৃষকই কৃষিকাজ ও ক্ষেত-খামার ছেড়ে দিয়েছিল। এসব করের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার আশায়, যার প্রতি তাদের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না, তারা খানকাহ ও উপাসনালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত। কেননা যেই লক্ষ্যে ও উদ্দেশে যুদ্ধ সংঘটিত হতো সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশের ব্যাপারে তাদের আদৌ আকর্ষণ ছিল না। ফলে বেকারত্ব ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং অবৈধ পন্থায় টাকা-পয়সা উপার্জনের ব্যাধি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক রাষ্ট্রের খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী রাজস্বের প্রধান মাধ্যম ইরানের কৃষককুল সম্পর্কে লেখেন:

"কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। তাদের ভাগ্য ছিল তাদের জমির সঙ্গে বাঁধা। বেগার শ্রমসহ সর্বপ্রকার শ্রমের কাজই তাদের থেকে গ্রহণ করা হতো। ঐতিহাসিক আম্মিয়ান মার্সেলিনিউস বলেন, 'বিশাল সৈন্যবাহিনীর পেছনে ঐসব হতভাগ্য কৃষককে পদব্রজে চলতে হতো। চিরস্থায়ী গোলামিই ছিল যেন ঐসব কৃষকের বিধিলিপি। এজন্য তাদের কোন প্রকার বেতন কিংবা পারিশ্রমিক দিয়ে উৎসাহিত করা হতো না'।[১] জমিদারদের সাথে কৃষকদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা সেইরূপই যেরূপ সম্পর্ক থাকে মনিবের সঙ্গে ক্রীতদাসের।"[২]

শাসকদের আচরণ

আমলা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ সাধারণ জনগণ ও রাজ্যের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে এমন রূঢ় ও নির্মম আচরণ করত যা ছিল বর্ণনাতীত। এ ব্যাপারে তারা ছিল নিদারুণ অসহায়। ঐসব কর্মকর্তা ও আমলা জনগণের জান-মালের যেমন কোন পরওয়াই করত না, তেমনি পরওয়া করত না তাদের ইয্যত-আব্রুর। লোকে অভিযোগ করত কিন্তু যাদের হাতে ক্ষমতার বাগডোর ছিল তারা এসবের প্রতি আদৌ কর্ণপাত করত না। লোকেরা শেষাবধি ধরেই নিয়েছিল যে, এই আঁধারপুরীই তাদের ভাগ্যের লিখন। এর হাত থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই। কোন কোন সময় তারা এ ধরনের জীবন যাপনের চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করত।

১. সাসানী আমলে ইরান, ৪২৪ পৃ:।
২. প্রাগুক্ত।

কৃত্রিম সমাজ ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন

রোম ও পারস্যে উভয় স্থানেই সাধারণভাবে লোকের কাঁধে ভোগ-বিলাসিতার এক ভূত চেপে বসেছিল। কৃত্রিম সভ্যতা ও প্রতারণাপূর্ণ জীবনের এক সর্বগ্রাসী প্লাবন জেঁকে বসেছিল—যার ভেতর তারা আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল। রোম ও পারস্যের সম্রাট এবং তাদের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গ অলস ঘুমে ছিল বিভোর। মজা ওড়াও, ফূর্তি কর, এ ছাড়া আর কোন চিন্তা-ভাবনা তাদের মস্তিষ্কে ঠাঁই পেত না। ভোগ-বিলাসিতার এমন এক স্বর্গরাজ্য তারা কায়েম করেছিল যেখানে কল্পনার পাখাও গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না। চাকচিক্য ও জৌলুসপূর্ণ জীবন, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্যে ছিল ভরপুর এবং এসব এত সূক্ষ্ম ও কারুকার্যময় ছিল যে, তাতে বুদ্ধিবিভ্রম ঘটা আদৌ বিচিত্র ছিল না।[১] পার্সী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়স-এর বর্ণনা মুতাবিক, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের মহলে বারো হাজার রমণী ছিল, পঞ্চাশ হাজার ছিল উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া, অগণিত মহল, নগদ অর্থ, হীরা জওয়াহেরাত ও নানাবিধ ভোগ-বিলাস সামগ্রী যার পরিমাপ করাও ছিল কঠিন। তার মহল আপন শান-শওকতে ও জৌলুস বৈচিত্র্যে ছিল তুলনাহীন।[২] ঐতিহাসিক ম্যাকারিয়স বলেন ঃ ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না যে, কোন বাদশাহ পারস্য সম্রাটদের মত বিলাসিতার স্রোতে এভাবে গা ভাসিয়েছেন যাদের কাছে উপহার-উপঢৌকন ও রাজস্বের অর্থ মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের শহরসমূহ থেকে আসত।[৩] মুসলিম বিজয়ের পর যখন ইরানীরা ইরাক থেকে উৎখাত হয় তখন তারা যেসব মহামূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী পেছনে ফেলে গিয়েছিল তার মূল্য নির্ণয় করাও কঠিন। পরিত্যক্ত সামগ্রীর মধ্যে মূল্যবান জড়োয়া সেট, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, রূপচর্চা সামগ্রী ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রধান। তাবারীর বর্ণনা মুতাবিক আরবরা মাদায়েন জয়ের পর এমন সব তাঁবু পেয়েছিল যেগুলো মোহরাংকিত সাজপূর্ণ ছিল। আরবরা বলেন, আমরা মনে করেছিলাম এর ভেতর বুঝি খাবারসামগ্রী আছে। খোলার পর জানতে পারলাম ওগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র।[৪]

ঐতিহাসিকগণ একটি কার্পেটের বর্ণনা দিয়েছেন যার ওপর বসে রাজসভাসদ ও অমাত্যবর্গ বসন্ত মৌসুমে মদ পান করত।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন:

'এর আয়তন ছিল ষাট বর্গ গজ। প্রায় এক একর জমির ওপর তা বিছানো যেতো। এর যমীন ছিল স্বর্ণের যার জায়গায় জায়গায় হীরা-জওয়াহেরাত ও

১. বিস্তারিত দ্র. সাসানী আমলে ইরান, ৯ম অধ্যায়। ২. তারীখে ইরান, শাহীন ম্যাকারিয়সকৃত, মিসর সং ১৮৯৮, পৃ. ৯০। ৩. প্রাগুক্ত, ২১১ পৃ. ৪. তারীখে তাবারী।

মণি-মুক্তার পুষ্প অংকিত ছিল। পুষ্প উদ্যান ছিল যার ভেতর ফুলযুক্ত ও ফলবান বৃক্ষ অবস্থিত ছিল। বৃক্ষের শাখা ছিল স্বর্ণের আর পাতা ছিল রেশমের। ফুলের কলি ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের আর ফল ছিল হীরা-জওয়াহেরাতের। এর চতুষ্পার্শ্ব ছিল হীরার ঝালরযুক্ত আর মাঝখানে বানানো হয়েছিল বীথিকা ও আঁকাবাঁকা নহর। আর এর সবই ছিল হীরা-জওয়াহেরাতের। হেমন্তকালে সাসানী বংশের রাজমুকুটধারিগণ এই হৈমন্তিক নিরসতাবিহীন উদ্যানে বসে শরাব পান করত এবং বিত্ত-সম্পদের এক বিস্ময়কর মনোহর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হতো যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো কোথাও দেখেনি।[১]

রোমান শাসনামলে সিরিয়া ও এর কেন্দ্রীয় শহরগুলোরও ঐ একই অবস্থা ছিল। এই উভয় হুকুমত বিলাসপ্রিয়তা ও সূক্ষ্ম শিল্পকলার ক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় ছিল লিপ্ত। রোমক সম্রাটগণ, তাদের সিরীয় নেতৃবর্গ ও প্রশাসকবৃন্দ খোলাখুলি ও প্রকাশ্যভাবে এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তাদের আলীশান মহল, দীওয়ানখানা, মদ্য পান ও নৃত্যগীতের মাহফিলগুলো বিলাস উপকরণ, সম্পদ ও প্রাচুর্যের আসবাব দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ইতিহাস ও কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, এই সব লোক বিলাসপ্রিয়তা ও আয়েশী বেশভূষার ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। হযরত হাসসান ইবন ছাবিত (রা) যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সিরিয়ার গাসসানী আমীর-উমারার দরবারে গিয়েছিলেন, জাবালা ইবনুল আয়হামের এ জাতীয় মজলিসের ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

"আমি দশজন দাসী দেখলাম, যাদের পাঁচজনই ছিল রোমের। তারা এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গান গাইছিল। আর বাকি পাঁচজন হীরার। তারা স্থানীয় সুরে গাইছিল যাদেরকে আরব সর্দার ইয়াস ইবন কুবায়সা উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছিল। এ ছাড়া আরব এলাকা, মক্কা প্রভৃতি থেকেও গায়ক-গায়িকাদের দল যেত। জাবালা যখন শরাব পানের জন্য বসত, তখন তার বসার ফরাশের ওপর নানা রকমের ফুল-চামেলী, জুঁই প্রভৃতি বিছিয়ে দেওয়া হতো এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে মিশ্‌ক ও আম্বর পরিবেশিত হতো। রৌপ্যের তশতরীতে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল কস্তুরী নিয়ে আসা হতো। শীতকালে সুগন্ধ চন্দন কাঠ জ্বালানো হতো। আর গ্রীষ্মকাল হলে বরফ বিছানো হতো এবং তার ও তার সাথীদের জন্য গ্রীষ্মের বিশেষ পোশাক নিয়ে আসা হতো যা দিয়ে তারা শরীর ঢাকত। শীতকালে মূল্যবান পশমী ও চর্মবস্ত্রাদি হাজির করা হতো।[২]

১. তারীখে ইসলাম, মওলভী আবদুল হালীম শররকৃত, ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃ. তারীখে তাবারী থেকে গৃহীত।
২. তারীখে তাবারী , ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃ.।

বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের গভর্নর, শাহযাদা, আমীর-উমারা ও উচ্চবিত্ত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাদশাহ্‌র পদাংক অনুসরণ করে চলত এবং পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রায় তাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করত। জীবনমান খুবই উঁচু এবং সমাজ খুবই জটিল হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তার নিজের জন্য, নিজ বসন-ভূষণের কোন একটি অংশের জন্য এত বেশি পরিমাণে খরচ করত যা একটি গোটা গ্রাম, মহল্লা কিংবা একটা গোটা বস্তির ভরণ-পোষণ ও লজ্জা নিবারণের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হতো। আর এমনটি করা সমাজ নিন্দা ও অবমাননার ভয়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট ও শরীফ লোকের জন্য অবশ্য করণীয় ছিল, এমন কি এও জীবনের এক অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শা'বী বলেন, ইরানের লোকেরা তাদের মাথায় যেই টুপি পরিধান করত তা হতো তাদের গোত্রীয় ও অবস্থানগত মর্যাদা মাফিক। গোত্রের শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটির টুপি হতো এক লক্ষ দিরহাম মূল্যের। এদেরই অন্যতম ছিলেন হরমুয। হীরা-জওয়াহেরাত-খচিত তাঁর শিরোপার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[১] আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল এই যে, তিনি ইরানের সাতটি শীর্ষস্থানীয় খান্দানের কোন একটির সদস্য হবেন। পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিয়ুক্ত হীরার গভর্নর ছিলেন আযাদিয়া (যাদওয়ায়হ)। সামাজিক অবস্থানগত মর্যাদার দিক দিয়ে তার অবস্থান ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের। এজন্য তার শিরোপার মূল্য ছিল ৫০ হাজার দিরহাম।[২] রুস্তমের মাথায় যে শিরোপা স্থান পেত তা সত্তর হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রী হয়েছিল আর এর প্রকৃত মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[৩]

লোকে এই চরমপন্থী সমাজ ও এর ধ্বংসাত্মক ঠাঁটবাটে এভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই সংস্কৃতি তাদের শিরা-উপশিরায় ও অস্থিমজ্জায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, এই কৃত্রিম লৌকিকতা ও আচার-অনুষ্ঠান তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং এর থেকে সরে আসা তাদের জন্য অসম্ভবপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। নাযুক থেকে নাযুকতর মুহূর্তেও এবং কঠিনতর আপতকালেও সহজ সরল জীবন যাপন ও সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। মুসলমানদের হাতে মাদায়েনের পতনের মুহূর্তে পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদাগির্দকে কী অসহায় অবস্থায় রাজধানী ছেড়ে পালাতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এরূপ তাড়াহুড়া ও পেরেশান অবস্থায়ও তিনি তাঁর সাথে যে পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গিয়েছিলেন তা থেকেই উক্তরূপ মানসিকতা ও

১. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড,, ৬ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ১১ পৃ। ৩. প্রাগুক্ত, ১৩৪ পৃ.।

সাংস্কৃতিক মাপকাঠি সম্পর্কে পরিমাপ করা যাবে। 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ

"ইয়াযদাগির্দ তাঁর সাথে এক হাজার বাবুর্চি, এক হাজার গায়ক, এক হাজার চিতা বাঘের রক্ষক, এক হাজার বাদ্যবাদক, এক হাজার বাজ পক্ষীপালক এবং আরও বহু লোক নিয়েছিলেন। আর এ সংখ্যাও তাঁর মতে তাঁর মর্যাদার তুলনায় খুবই কম ছিল।"[১]

পরাজয়ের পর হরমুযান যখন প্রথমবারের মত মদীনায় আগমন করল এবং হযরত ওমর (রা)-এর মজলিসে হাজির হলো তখন সে পানি চায়। একটা মোটা পেয়ালায় পানি আনা হলে সে বলেছিল ঃ আমি পিপাসায় মারা যাই সেও ভাল, কিন্তু এই বিশ্রী পেয়ালায় পানি পান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে অন্য পাত্রে পানি আনা হলে সে তা পান করে।[২]

এই দু'টো ঘটনা থেকেই পরিমাপ করা যাবে যে, ইরানীদের অভ্যাস কতটা বিকৃত, কৃত্রিম জীবন ও লৌকিকতায় তারা কতটা অভ্যস্ত এবং প্রকৃতিসম্মত সহজ সরল জীবনযাত্রা থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছিল!

অর্থের প্রাচুর্য ও বিত্তের ছড়াছড়ি

এরূপ বিলাসিতা ও অপচয়পূর্ণ জীবনের অনিবার্য পরিণতি ছিল এই যে, সাধারণ জনগণের ওপর এত বিবিধ প্রকার কর ধার্য করা হবে যার ভার বহন করা হবে তাদের সাধ্যাতীত। এমন সব আইন নিত্যই প্রণীত হবে যার দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কারিগরদের উপার্জিত সম্পদ নানাভাবে শোষণ করা যায়। পরিণতি এতদূর গিয়ে পৌঁছে যে, নিত্য দিনের এই বর্ধিত ও বিপুল অংকের করভারে প্রজাদের কোমর ভেঙে যায় এবং হুকুমতের নিত্য নতুন চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। 'সাসানী আমলে ইরান' গ্রন্থের লেখক বলেন:

"নিয়মিত কর ছাড়াও প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে নযরানা গ্রহণের প্রথা আইনের নামে চালু ছিল। এই আইন অনুসারে ঈদ, নওরোয ও মেহেরেগান উপলক্ষে লোকের কাছ থেকে যবরদস্তিমূলকভাবে উপঢৌকন আদায় করা হতো। শাহী ভাণ্ডারের আমদানী উৎসের ভেতর আমাদের ধারণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল জায়গীর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় এবং সেই সব উপায় বা মাধ্যম যা সম্রাটের বিশেষ অধিকার হিসেবে নির্ধারিত ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়

১. সাসানী আমলে ইরান, ৬৮১ পৃষ্ঠা;
২. তাবারীর ইতিহাস, ৪র্থ, ১৬১ পৃ.।

যে, আর্মেনিয়ায় অবস্থিত ফারিঙ্গী এলাকার স্বর্ণ-খনির যাবতীয় আয় সম্রাটের ব্যক্তিগত আয় হিসেবে গণ্য ছিল।"[১]

সিরীয় ঐতিহাসিক রোমক হুকুমতের কর্মপন্থা এবং এর আমদানি-রফতানি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন:

"সিরীয় প্রজাদের ওপর হুকুমতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কর আদায় করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ও আয়-উপার্জনের এক-দশমাংশ ও মূলধনের ট্যাক্স দিতে হতো। মাথাপ্রতি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়াও রোমকদের আয়-আমদানির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎসও ছিল, যেমন নগর শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ও অন্যবিধ রাজস্ব। এ ছাড়া যেসব জমি গম চাষের উপযোগী ও পশু চারণ ভূমি সেগুলো চুক্তির ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া হতো আর এসব ইজারাদার (ঠিকাদার)-কে 'আশশারীন' বলা হতো। এসব লোক সরকার থেকে টোল আদায়ের অধিকার খরিদ করত এবং প্রজাদের থেকে ধার্যকৃত অর্থ আদায় করত। প্রতি প্রদেশে এই সব ইজারাদারের কয়েকটি কোম্পানী থাকত। আর এই সব কোম্পানীতে কিছু মুনশী ও তহশীলদার নিয়োগপ্রাপ্ত হতো যারা নিজেদেরকে অফিসার ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরূপে জনগণের সামনে পেশ করত এবং নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত কর আদায় করত। তারা সাধারণ মানুষকে আরাম ও আয়েশী জীবন যাপনের উৎস থেকে মাহরূম করত এবং প্রায়ই তাদেরকে ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রিও করে দিত।"[২]

রোমকদের রাজনৈতিক নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"উত্তম রাখাল সেই যে তার ভেড়ার লোম কাটে বটে, কিন্তু চেঁছে ফেলে না। ঘটনা এই যে, দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে রোম সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের বাসিন্দাদের লোম কাটছেন (চেঁছে ফেলতে চেষ্টা করেন নি)। তিনি তাদের থেকে বিরাট অংকের অর্থ আদায় করছেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাদেরকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষাও করছেন।"[৩]

জনগণের দুঃখ-দুর্দশা

রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা দু'টো পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দুই শ্রেণীর ভেতর সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। এক শ্রেণীতে ছিলেন

১.সাসানী আমলে ইরান, ১৬১ পৃ.।
২. খুতাতু'শ-শাম, মুহাম্মদ কুর্দ আলীকৃত, ৫ম খণ্ড, ৪৭ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত।

রাজা-বাদশাহ, শাহযাদাবৃন্দ, দরবারের সঙ্গে যুক্ত সভাসদ, তাদের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-বান্ধব ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জায়গীরদার ও বিত্তশালী সম্প্রদায়। এ সমস্ত লোক চিরশ্যামল সবুজ বসন্ত উদ্যানে পুষ্প শয্যায় জীবন যাপন করত। তাদের ঘরের লোক ও শিশুরা সোনা-চাঁদি নিয়ে খেলা করত এবং দুধ ও গোলাপ জলের মধ্যে গোসল করত। তাদের ঘোড়ার নালগুলোও তারা জওয়াহেরাত দ্বারা মুড়িয়ে রাখত এবং দরজা ও দেওয়ালগুলোকেও রেশম ও কিংখাব দ্বারা সজ্জিত করত।

দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বণিকদের যাদের জীবন ছিল আপাদমস্তক দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এরা জীবনের বোঝা, নিত্য-নৈমিত্তিক ট্যাক্স ও উপহার-উপঢৌকনের ভারে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। তাদের শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি-উপগ্রন্থি নানারূপ দাবির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। আর তারা এই জাল ছিন্ন করার জন্য যেই পরিমাণ চেষ্টা করত এবং যেই পরিমাণ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করত সেই জাল ঢিলা হবার পরিবর্তে আরও বেশি কষে যেত। এই কঠিন ও কষ্টপূর্ণ জীবনের ওপর আরেকটি মুসীবত ছিল এই যে, তারা অনেক ব্যাপারেই উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণ করতে গিয়ে আরো বেশি পেরেশানীর শিকার হতো জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে তাদের যেটুকুর সম্মুখীন হতে হতো না। ফলে তাদের জীবন ছিল অহরহ বিস্বাদ এবং আপাদমস্তক যন্ত্রণাপূর্ণ। তাদের মস্তিষ্ক সর্বদাই পেরেশান ও বিশৃংখল থাকত। প্রকৃত শান্তি-সুখ ও চিত্তের প্রশান্তি তাদের কখনোই জুটতো না।

লাগামহীন বিত্তবান ও আত্মবিস্মৃত দরিদ্র

পুঁজিবাদের অবাধ্যতা ও আল্লাহ্-বিস্মৃতি এবং দারিদ্র্যের অসহায়ত্ব ও আত্মবিস্মৃতির দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের দাওয়াত ও তা'লীম দোদুল্যমান ছিল। মহৎ চরিত্র ও জীবনের উন্নত মূলনীতি গোটা সভ্য দুনিয়ায় পরিত্যক্ত ও অকার্যকর মনে করা হচ্ছিল। ধনী ও বিত্তবানদের নিজেদের ক্রীড়া-কৌতুকের নেশা ও বিলাস-ব্যসনের দরুন ফুরসৎই ছিল না যে তারা দীন-ধর্ম কিংবা পরকাল সম্পর্কে কিছু ভাববে। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর জীবন-যন্ত্রণা নিত্যকার চিন্তা-ভাবনা ও জীবনের বর্ধিত দাবি তাদের এই অবকাশই দিত না যে, তারা প্রতিদিনের খোরাক ও প্রয়োজনাদি ছাড়া আর কোন দিকে মনোনিবেশ করবে। মোটকথা, জীবন ও জীবনের দাবি ধনী-দরিদ্র সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল এবং এরই ভেতর সবাই পেরেশান ছিল। জীবনের চাকা তার পূর্ণ শক্তিতে ঘুরছিল যদ্দরুন তাদের এতটুকু অবকাশ ছিল

না যে, তারা দীন-ধর্মের দিকে মনোসংযোগ করবে এবং হৃদয় ও আত্মা সম্পর্কে, মানবতার উন্নততর মূল্যবোধ সম্পর্কেও একটু চিন্তা-ভাবনা করবে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) [মৃ. ১১৭৬ হি.] তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা'-য় ইসলাম-পূর্ব যুগের এমত অবস্থারই পরিপূর্ণ ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

"শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে করতে এবং দুনিয়ার স্বাদ ও আমোদ-আহ্লাদের ভেতর লিপ্ত থেকে পরকালীন জীবন একেবারেই বিস্মৃত হবার এবং শয়তানের পরোপুরি খপ্পরে পড়ে যাবার দরুন ইরানী ও রোমীয়দের জীবনের সারল্য ও উপকরণের ভেতর বিরাট সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও নাযুক ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তারা বিলাসবহুল জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে এসব কেন্দ্রে বড় বড় গুণী ও কুশলী শিল্পী এসে জমায়েত হয়েছিল যারা এসব বিলাস উপকরণ ও আরাম-আয়েশের ভেতর কমনীয়তা ও পেলবতা সৃষ্টি করত এবং নিত্য-নতুন সাজগোজ ও প্রসাধনী বের করত। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে এর ওপর আমল শুরু হয়ে যেত। কেবল তাই নয়, বরাবর তা বৃদ্ধি পেতে থাকত এবং এ নিয়ে গর্ব করা হতো। জীবনমান এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আমীর-উমারার ভেতর কারুর এক লক্ষ টাকার কম মূল্যের মেখলা বা কোমর বন্ধনী বা শিরোভূষণ পরিধান রীতিমত অমর্যাদাকর ছিল। যদি কারুর কাছে আলীশান মহল, ফোয়ারা, হাম্মাম, বাগ-বাগিচা, উত্তম খোরাক, তৈরি পশু, সুদর্শন যুবক ও দাস-দাসী না থাকত, খাবারের ভেতর লৌকিকতা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ভেতর শোভা-সমৃদ্ধি না থাকত তাহলে সতীর্থদের মধ্যে তার কোন সম্মান হতো না। এর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। নিজ দেশের রাজা-বাদশাহদের[১] অবস্থা সম্পর্কে যা দেখছ ও জান এর থেকেই তোমরা তা অনুমান করতে পারবে।

"এই সব লৌকিকতা তাদের জীবন ও সমাজ-সামাজিকতার অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দিলের ভেতর এমনভাবে বসে গিয়েছিল যা কোনভাবেই বের হবার নয়। এর ফলে এমনই এক দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা তাদের গোটা নাগরিক জীবন এবং তাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক রীতিনীতির ভেতর অনুপ্রবেশ করেছিল। এ ছিল এক বিরাট মুসীবত যার হাত থেকে বিশিষ্ট ও সাধারণ, ধনী-গরীব কেউই মুক্ত ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকের ওপর এই কৃত্রিম লৌকিকতাপূর্ণ ও আমীরানা জীবনযাত্রা এমনই জেঁকে বসেছিল যা তাদের জীবনকে দুর্বহ ও দুর্বিষহ করে তুলেছিল এবং তাদের মাথার ওপর

১. দিল্লীর মুগল সম্রাটদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার এক বিরাট পাহাড় সব সময় ঝুলত। ব্যাপার ছিল এই যে, এই সব লৌকিকতা বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে হাসিল করা যেত না। আর এই সব অর্থ ও অপরিমেয় সম্পদ কৃষককুল, ব্যবসায়ী বণিক ও অপরাপর পেশাজীবী লোকদের ওপর খাজনা-ট্যাক্স না বসিয়ে ও বিবিধ প্রকার কর বৃদ্ধি না করে, তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে না তুলে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। যদি তারা এসব দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত তাহলে তাদের ওপর লোক-লশকর, পাইক-পেয়াদা ও বরকন্দাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তাদের শাস্তি দেওয়া হতো। আর দাবি পূরণ করলে তাদেরকে গাধা ও কলুর বলদ বানানো হতো যাদের দিয়ে ক্ষেতে পানি দেওয়াসহ ক্ষেত মজুরের কাজ নেওয়া হতো। আর কেবল শ্রম দেবার জন্যই তাদের লালন-পোষণ করা হতো। কঠোর-কঠিন শ্রমের হাত থেকে তারা কখনোই মুক্তি পেত না। এই কঠোর শ্রমপূর্ণ ও পশু জীবনের ফল হতো এই যে, তারা কোনদিনই মাথা তুলবার এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের চিন্তা বা ধারণা করবারও অবকাশ পেত না। অনেক সময় গোটা দেশে এমন একজন লোকও পাওয়া যেত না যার কাছে আপন দীন বা ধর্মের কোন চিন্তা-ভাবনা বা গুরুত্ব থাকত।"[১]

বিশ্বব্যাপী অন্ধকার

মোদ্দা কথা, এই ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন জাতিগোষ্ঠী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না যাদেরকে সুরুচিসম্পন্ন বলা যায়। সে যুগে না ছিল কোন উচ্চতর মূল্যবোধের ধারক-বাহক কোন সমাজ, না ছিল এমন কোন হুকুমত যার বুনিয়াদ ন্যায়নীতি ও প্রেমপ্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন প্রতিভাবান কোন নেতৃত্ব ছিল না এবং এমন কোন ধর্ম ছিল না যা সহীহ্‌শুদ্ধ এবং যা আম্বিয়া-ই কিরাম-এর দিকে সহীহ্‌ভাবে সম্বন্ধযুক্ত আর তাঁদের শিক্ষামালা ও সমূহ বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক। এই ঘনঘোর অন্ধকার মাঝে কোথাও কোন ইবাদতগাহ ও খানকাহ্‌র মাঝে কখনো যদিও বা যৎসামান্য আলোক-রশ্মি চোখে পড়ত তার অবস্থাও ছিল এমন যেন বর্ষাঘন অন্ধকার রাত্রে জোনাকির আলো। সহীহ্‌ ইলম ও বিশুদ্ধ আমল এত দুর্লভ ও দুষ্পাপ্য ছিল এবং আল্লাহ্‌র সোজা-সরল রাস্তার সন্ধান দানকারীর সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলত যে, ইরানের বুলন্দ

---

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, باب اقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم দ্র.

২. হযরত সালমান ফারসী (রা.)-র কাহিনী ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এবং বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার নিরীখে উৎরে যাবার দরুন তা ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ ও দলীল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইমাম আহমদ-এর মুসনাদ এবং হাকেমের মুস্তাদরাকে এর বিস্তৃত বিবরণ মিলবে।

হিম্মত, অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির যুবক সালমান ফারসী যিনি আপন জাতিগোষ্ঠী ও বংশীয় ধর্ম (অগ্নি পূজা) থেকে অতৃপ্ত ও নিরাশ হয়ে সত্যের সন্ধানে ইরান থেকে শুরু করে সিরিয়ার শেষ সীমান্ত অবধি দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূভাগ চষে ফিরে মাত্র চারজন মানুষ এমন পেয়েছিলেন যাঁদের থেকে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত এবং অশান্ত হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছিল এবং যাঁরা তাঁদের নবী-রসূলদের কথিত ও প্রদর্শিত পথের ওপর কায়েম ছিলেন।[২]

বিশ্বব্যাপী এই অন্ধকার ও অরাজকতার যেই চিত্র কুরআন মজীদ এঁকেছে এর থেকে সুন্দর চিত্র আঁকা আদৌ সম্ভব নয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ-

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ (বিপর্যয়) ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।" (আল-কুর-আন ৩০:৪১)

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর

নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাব

মানবতা যখন মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, দুনিয়া তার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালতসহ প্রেরণ করেন যাতে করে তিনি এই মুমূর্ষু মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

الٓرٰ قف كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ -

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে করে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।" (আল-কুরআন, ১৪:১)

তিনি মানব জাতিকে কেবল এক আল্লাহ্‌র বন্দেগীর দিকে আহ্‌বান জানান এবং দুনিয়ার যাবতীয় বন্দেগী ও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেন। জীবনের প্রকৃত নেয়ামতরাজি (যে সব থেকে মানুষ নিজেকে মাহরূম করে দিয়েছিল) পুনর্বার তাকে দান করেন এবং সেই লৌহ শৃঙ্খল ও বেড়ি থেকে মুক্ত করেছিলেন যা তারা অপ্রয়োজনে নিজের ওপর ফেলে রেখেছিল।

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"যে তাদের সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে যা তাদের ওপর ছিল।" (আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৫৭)

তাঁর আবির্ভাব মানব জাতিকে নবজীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নবতর শক্তি, নতুন উত্তাপ, নতুন ঈমান, নবতর প্রত্যয়, নতুন বংশধারা, নতুন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, নতুন সমাজ দান করে। তাঁর আগমনে দুনিয়ায় নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মের নবজীবনের সূত্রপাত হয়। কেননা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহত্যার ভেতর যেই যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে তা ধর্তব্য নয়। চক্ষুষ্মান ও অন্ধ এবং জীবিত ও মৃতকে এক পাল্লায় রাখা চলে না।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ - وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ - وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُ
وْرُ - وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ط

"সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।" (আল-কুরআন ৩৫ ঃ ১৯-২২)

জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝে যেই ব্যবধান ছিল এর থেকে বড় কোন ব্যবধান নেই। কিন্তু এই ব্যবধান যেই দ্রুততার সাথে অতিক্রান্ত হয় দুনিয়ার বুকে এরও কোন নজীর নেই। দুনিয়া তাঁরই নেতৃত্বে এই দীর্ঘ সফর কিভাবে অতিক্রম করেছিল এবং জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে কিভাবে উত্তরণ ঘটেছিল পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় সেই প্রশ্নেরই জওয়াব সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

জাহেলিয়াতের সংক্ষিপ্ত চিত্র

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক পরিমাপ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে দুনিয়ার অবস্থা এমন একটি ঘরের মতই ছিল যার ভিত্তি এক প্রবল ভূমিকম্প দুর্বল ও নড়বড়ে করে দিয়েছিল। প্রতিটি বস্তু ছিল স্থানচ্যুত ও সামঞ্জস্যহীন। এই ঘরের সাজ-সরঞ্জাম সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। ভাঙাচোরার হাত থেকে বেঁচে যাওয়াগুলোর আকার-আয়তন পাল্টে গিয়েছিল। এক জায়গার জিনিস আরেক জায়গায় গিয়ে পড়ে ছিল। কোথাও সামানের স্তূপ, আবার কোথাও একেবারে খালি। দর্শক সেখানে এমন সব মানুষ দেখতে পেত যাদের চোখে তাদের নিজেদের অস্তিত্বই ছিল নগণ্য ও মূল্যহীন। তারা গাছপালা, প্রস্তরখণ্ড ও পানির পূজা করতে শুরু করেছিল, এমন কি তারা নিষ্প্রাণ ও জড় বস্তুমাত্রকেই পূজা করতে শুরু করেছিল। তাদের বিকৃতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থূল সত্যগুলো বুঝতেও তারা অক্ষম ছিল। তাদের চিন্তাশক্তিও বিশৃংখল ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনুভূতি ভুল পথে চলছিল। স্থূল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থূল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিল। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত এবং

সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তাদের রুচি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিক্ত ও বিস্বাদ জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিল। তাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে শত্রুতা এবং শত্রু ও অশুভাকাঙক্ষীর সঙ্গে ছিল তাদের বন্ধুত্ব।

সমাজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। এ যেন গোটা বিশ্বেরই একটি ছোট সংস্করণ! প্রতিটি বস্তুই ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে চোখে পড়বে। এই সমাজে নেকড়ে বাঘকে মেষপালের রাখালী করতে দেওয়া হয়েছিল আর বানরকে দেওয়া হয়েছিল পিঠা ভাগ করতে। এই সমাজে দুরাচারী অপরাধীরা ছিল সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকেরা ছিল দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ এ সমাজে আর কিছুই ছিল না।

এ সমাজের আচার-আচরণ ছিল ধ্বংসাত্মক যা এই দুনিয়াটাকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। মদ পান, মস্তানি, চরিত্রহীনতা, উন্মত্ততা, সুদখোরী, লুটপাট, ছিনতাই ও অর্থলিপ্সা চরমে পৌঁছেছিল। নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। শিশুদেরকে তাদের শৈশবেই হত্যা করা হতো। রাজা-বাদশাহরা আল্লাহ্‌র মালকে হাতের ময়লা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের ক্রীতদাস মনে করত। সাধু-সন্তরা খোদা সেজে বসেছিল। লোকের মাল না-হক খেত, ওড়াত এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরানো ছাড়া তাদের আর কোন কাজ ছিল না।

আল্লাহপ্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নষ্ট অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিল। এর থেকে কোন উপকার গ্রহণ বা সঠিক স্থানেই তা ব্যবহার করা হচ্ছিল না। শৌর্য-বীর্য জুলুম-যবরদস্তিতে, উদারতা ও বদান্যতা অপব্যয় -অপচয়ে, গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ জাহেলী অহমিকায়, মেধা প্রতারণা ও অপকৌশলে রূপান্তরিত হয়েছিল। জ্ঞানবুদ্ধির কাজ কেবল এটাই ছিল যে, অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করবে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করবে।

মানুষ ও মূল্যবান মানবীয় সম্পদ বহুকাল থেকেই নষ্ট হচ্ছিল। মানুষই ছিল এমন এক কাঁচামাল যার ভাগ্যে অভিজ্ঞ কোন কারিগর জোটে নি যিনি তা থেকে সংস্কৃতির বিশুদ্ধ অবকাঠামো তৈরি করতে পারতেন। এ ছিল যেন কাঠের তক্তার স্তূপ যা বৃষ্টিতে ভিজে ও রোদে পুড়ে নষ্ট হচ্ছিল। এমন কেউ ছিল না যিনি এগুলো জোড়া দিয়ে যিন্দেগীর জাহাজ নির্মাণ করতেন।

সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতিগোষ্ঠীর স্থলে ভেড়ার কয়েকটি পাল চোখে পড়ত যার কোন রাখাল ছিল না। রাজনীতি ছিল সেই উটের ন্যায় যার নাকে দড়ি নেই অর্থাৎ বল্গাহীন আর শক্তি ছিল এমন এক তলোয়ার যা এক পাঁড়-মাতালের হাতে গিয়ে পড়েছিল যদ্দারা সে স্বয়ং নিজেকে এবং নিজ সন্তান ও ভাইদেরকে আহত ও ক্ষতবিক্ষত করছিল।

আংশিক সংস্কারের ব্যর্থতা

এই খারাপ ও অধঃপতিত জীবনের প্রতিটি শাখা সংস্কারকের সমগ্র জীবনই কামনা করছিল। অরাজকতার প্রতিটি দিক এর হকদার ছিল যে, সে তার (সংস্কারকের) সমগ্র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে এবং তাঁকে একটি মুহূর্তের জন্যও ফুরসৎ দেবে না। সংস্কারক যদি কোন সাধারণ মানুষ হতো, যে ওহী ও নবূওতীর পথ-নির্দেশের পরিবর্তে আপন জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা কাজ করত তাহলে সে এই জীবনের একই দিকের উপর তার সমগ্র প্রয়াস নিয়োজিত করত এবং গোটা জীবন সমাজের কেবল একটি ব্যাধি নিরাময়ের জন্য উৎসর্গ করে দিত। কিন্তু এর দ্বারা বিরাট কোন লাভ হতো না এজন্য যে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটা খুবই জটিল ও নাযুক। এর ভেতর বহু চোরা দরজা রয়েছে এবং আশ্চর্য ধরনের সব ছিদ্র ও ফাঁক রয়েছে। এর আসল দুর্বলতা ও কেন্দ্রীয় সমস্যাটা ধরতে পারা সহজ নয়। যখন সামাজিক মানুষের রুচি বিকৃতি ঘটে যায় তখন তার কেবল একটি দোষ দূর করা কিংবা একটি মাত্র দুর্বলতার পেছনে লাগা ফলপ্রসূ নয়, তেমনি ফলপ্রসূ নয় কোন একটা অভ্যাস সংশোধন করা যতক্ষণ পর্যন্ত এর মোড় মন্দের দিক থেকে ফিরিয়ে ভালোর দিকে এবং খারাপের দিক থেকে ফিরিয়ে সঠিক দিকে না ফেরানো হবে এবং যিন্দেগীর ভেতর যেসব আগাছা জন্মেছে তা উপড়ে না ফেলা হবে, আর এর যমীন ঘাস ও আপন থেকেই উদ্‌গত চারা গাছ মুক্ত না করা হবে যাতে করে নেকী ও কল্যাণের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা এবং আল্লাহ তা'আলার ভীতির চারা তার অন্তরে রোপণ করা যায়।

মানব সমাজের প্রতিটি দুর্বলতা ও প্রতিটি দোষ-ত্রুটি সংশোধনার্থে সমগ্র জীবনের দাবি জানায়। কোন কোন সময় একটা আস্ত সংস্কারী দলের জীবন এর মুকাবিলায় নিয়োগ করেও এর সংশোধন হয় না। যদি কোন দেশে মদের কুঅভ্যাস জেঁকে বসে আর তা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তাহলে তাদের মদ পান থেকে বিরত রাখা খুব সহজ নয়। মদ পান মানুষ কেন করে? এটা কিসের ফল? এটা এমন এক মানসিকতা ও মেযাজের ফল ফসল যা আনন্দ ফূর্তি ভালবাসে, চাই কি সেই আনন্দ-ফূর্তি বিষাক্তই হোক না কেন। তা আত্ম-বিলুপ্তি ও আত্মবিস্মৃতির দাবি জানায়. চাই কি এর জন্য হাজারো গোনাহই

করতে হোক। এই মানসিকতাকে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনী দ্বারা মদের স্বাস্থ্যগত কুফল ও ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ লিখে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর আইন তৈরি করে ও তা কঠিনভাবে প্রয়োগ করে এবং জরিমানা করে তা প্রতিরোধ করা যায় না। একে কেবল গভীর মানসিক পরিবর্তনের দ্বারাই প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা যায়। এছাড়া অপর কোন পন্থা আবিষ্কার করলে হয় অপরাধ অন্য কোন রূপে আবির্ভূত হবে এবং নিজের জন্য অন্য পথ সৃষ্টি করে নেবে।

পয়গম্বর ও রাজনৈতিক নেতার মধ্যে পার্থক্য

আরব দেশে কাজের খুবই বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি কোন জাতীয় কিংবা দেশপ্রেমিক নেতা হতেন এবং তাঁর কর্মপন্থা ও কর্ম পদ্ধতি রাজনৈতিক ও দেশীয় নেতাদের মত হতো তাহলে তাঁর সামনে সর্বোত্তম পন্থা ছিল এই যে, তিনি আরব ভূখণ্ডকে একটি দেশ বলে অভি-হিত করে আরব গোত্রগুলোর একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম প্রতিষ্ঠা করতেন এবং আরবদের সংহত ও সুদৃঢ় শক্তির সাহায্যে একটি পাকাপোক্ত ও যুদ্ধংদেহী ব্লক বানাতেন এবং একটি আরব রাষ্ট্র কিংবা প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতেন সহজেই যার তিনি প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারতেন। এমতাবস্তায় আবূ জহল, ওৎবা প্রমুখ তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করত এবং তাঁকে আরবের নেতৃত্ব সমর্পণ করত। কেননা তারা তাঁর সততা ও আমানতদারী প্রত্যক্ষ করেছিল আর তাঁকে মক্কায় সব চাইতে জটিল মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সালিশ মেনেছিল। কুরায়শদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সামনে আরবের নেতৃত্বের পদ দানের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং বলেছিল, আপনি যদি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের এতটুকু অমত নেই। আপনি আজীবন আমাদের নেতা থাকবেন। আর যদি এই রাজনৈতিক অবস্থানগত মর্যাদা লাভ করতেন তখন তাঁর জন্য পারসিক কিংবা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা খুবই সহজ হয়ে যেত। তিনি আরবের অশ্বারোহীদের সাহায্যে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করতে পারতেন এবং অনারব শক্তিসমূহকে পদানত করে রোম ও পারস্যের ওপর আরবদের বিজয় ডংকা বাজাতে পারতেন। এটা কত বড় চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন ছিল এবং আরবদের জাতিগত ও গোত্রীয় অহমিকার পরিতৃপ্তির জন্য এর ভেতর কতটা খোরাক ছিল। আর এই উভয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে একই সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াকে যদি তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিপন্থী মনে করতেন তাহলে ইয়ামন ও আবিসিনিয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়ে এ দুটোকে তার নবোত্থিত হুকূমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া তেমন কঠিন কিছুই ছিল না।

স্বয়ং আরবেই এত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান ছিল যেগুলো সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা, জাতীয় সংগঠন, ব্যবস্থাপনাগত

যোগ্যতা ও সর্বোচ্চ ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা করছিল বছরের পর বছর ধরে। একজন সর্বোচ্চ মানের শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নেতা আরবের স্থানীয় সংস্কার-সংশোধন ও সংগঠিত করত তাদেরকে দুনিয়ার এক বিরাট বড় শক্তি এবং এক মর্যাদাবান রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারতেন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এজন্য আবির্ভূত ও প্রেরিত হন নি যে, একটি বিকৃতি দূর করে তার স্থলে আরেকটি বিকৃতি আনবেন, একটি অন্যায় দূর করে আরেকটি অন্যায়ের জন্ম দেবেন, এক জিনিসকে এক জায়গায় বৈধ এবং অন্য জায়গায় সেটাকেই অবৈধ করবেন, এক জাতির স্বার্থপরতা ও স্বার্থান্ধতার বিরোধিতা করবেন এবং অন্য জাতির স্বার্থপরতা ও স্বার্থান্ধতাকে উৎসাহিত করবেন। তিনি দেশপূজারী লিডার ও একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আগমন করেন নি যে, একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন ও উজাড় করে দিতে অপর জাতিগোষ্ঠীকে আবাদ করবেন। অন্য জাতিগোষ্ঠীর সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে আপন জাতি ও আপন সম্প্রদায়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন এবং মানুষকে রোম ও পারস্যের গোলামী থেকে মুক্ত করে আদনান বংশের ও কাহতান সন্তানদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন।

তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই ছিল দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে জান্নাতের সুখবর শোনানো এবং পরকালীন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। তিনি দাঈ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, সিরাজাম মুনীরা তথা প্রদীপ্ত প্রদীপ হয়ে এসেছিলেন গোটা পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল দুনিয়াকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে কেবল আল্লাহ্‌র গোলামীতে ন্যস্ত করতে, মানুষকে বস্তুগত জীবনের কাল কুঠরী থেকে বের করে দুনিয়া ও আখিরাতের বিস্তৃত ও প্রশস্ত অঙ্গনে টেনে নিতে, নানাবিধ ধর্ম ও মতাদর্শের বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফী থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের দ্বারা ধন্য ও তৃপ্ত হবার সুযোগ দিতে। তাঁর কাজ ছিল সৎ কাজে উৎসাহ দান, অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্তকরণ, পাক-পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং নাপাক ও নোংরা জিনিসকে হারাম প্রতিপন্ন করা এবং সেই সব শেকল ও বেড়ি থেকে মুক্তকরণ যা মানুষ তার অজ্ঞতার দরুন কিংবা মযহাব ও হুকূমত জোর-যবরদস্তির করে মানুষের পায়ে পরিয়ে দিয়েছিল।

এজন্যই তাঁর সম্বোধন কেবল একটি জাতিগোষ্ঠী কিংবা কোন একটি দেশের অধিবাসীর উদ্দেশে ছিল না। তাঁর সম্বোধন ছিল তাবৎ মানব জাতির উদ্দেশে, গোটা মানব জাতির বিবেকের প্রতি। আরব জাতি সীমাতিরিক্ত পশ্চাৎপদতা,

এবং রাজনৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের দরুন অবশ্যই এর হকদার ছিল যে, তাঁর অভিযান সেখান থেকেই শুরু করা হবে এবং নবুওতী কাজের সূচনাও সেই জাতির ভেতর হবে। উম্মুল কুরা (বিশ্ব কেন্দ্র, মক্কা মু'আজ্জমা) ও আরব উপদ্বীপ তার ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার কারণে তাঁর চেষ্টা ও সাধনার জন্য সর্বোত্তম কেন্দ্রও ছিল এবং আরব জাতি তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন তাঁর পয়গামের সর্বোত্তম বাহক এবং তাঁর দাওয়াতের বোঝা বহনের সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন দূত হতে পারত।

তিনি সেসব সংস্কারকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা আপন জাতি অথবা যুগের কতকগুলো সামাজিক দুর্বলতা কিংবা চারিত্রিক নষ্টামি দূর করতে সচেষ্ট হন এবং সাময়িকভাবে সেসব রোগ-ব্যাধির অপনোদনে সফলতা লাভ করেন কিংবা ব্যর্থ হয়ে জগৎ সংসার থেকে বিদায় নেন।[১]

মানবতার সমস্যার সঠিক সমাধান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পথ-নির্দেশনাধীনে দাওয়াত ও সংস্কার সংশোধনের কাজ সহীহ্ রাস্তায় শুরু করেন। তিনি মানব স্বভাবের তালায় সঠিক চাবি লাগান। এ ছিল সেই তালা যা খুলতে সে যুগের সমস্ত সংস্কারক ছিলেন ব্যর্থ। তিনি মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, তাঁর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন এবং বাতিল তথা মিথ্যা উপাস্য দেবদেবীসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে বললেন। সেই সঙ্গে তাগূত (আল্লাহ ব্যতিরেকে সকল সত্তা, সাধারণভাবে যেগুলোর গোলামী ও আনুগত্য করা হয়) অমান্য করতে নির্দেশ দান করেন। লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে সজোরে উচ্চ কণ্ঠে তিনি বলেনঃ يا ايها الناس قولو ا لا اله الا الله تفلحو

১. গান্ধীজি তার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা থেকে দুটো শক্তিশালী মুলনীতি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন এবং এ দু'টো মূলনীতির ওপর ত্াঁর সেই সব শক্তি, মেধাগত ও জ্ঞানগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য এবং সর্বপ্রকার উপকরণ ব্যয় করেন যা এ যুগে খুব কম সংখ্যক লোকই করে। প্রথম মুলনীতি ছিল অহিংস নীতি যেদিকে তিনি একটি স্থায়ী ধর্ম ও দর্শন হিসেবে আহ্বান জানান এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু যেহেতু এই পন্থা মানসিক পরিবর্তন ও ধর্মের মৌলিক দাওয়াতের পন্থা থেকে পৃথক ছিল, তাই তাঁর আহ্বান সেই গভীর পরিবর্তন ও প্রভাব সৃষ্টি করেনি যা আম্বিয়া আলায়হিস সালাম তাঁদের সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর ভেতর সৃষ্টি করে যান। তিনি স্বয়ং তাঁর স্বচক্ষেই ভারতবর্ষের বুকে সেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেন যেই দাঙ্গায় তাঁর অহিংস নীতি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পদ-দলিত করা হয় এবং বর্বরতা ও পশু শক্তির নিকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে। এই ঘটনা গান্ধীজির জন্য কঠিন হৃদয় বিদারক ও অসহনীয় হয়ে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং তাঁকেই হিংসার শিকার হতে হয় যার বিরুদ্ধে তিনি সারাটা জীবন লড়ে ছিলেন। দ্বিতীয় মূলনীতি অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গের পরিত্যাগ। তাঁর ঐ অভিযান তেমন সফল হয় নি। এসব প্রমাণ দেয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর রাস্তাই ছিল সঠিক ও ফলপ্রসূ এবং সেটাই সফল রাস্তা।

"হে লোকসকল! তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই)–সফলতা লাভ করবে।"

জাহেলিয়াত ইসলামের মুকাবিলায়

জাহেলী সমাজ এই দাওয়াত এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে ভুল করেনি এবং এর ভেতর সে কোন জটিলতাও অনুভব করেনি। যেই শ্রোতাবৃন্দের কানে তাঁর আওয়াজ পৌঁছেছে তখনই তারা বেশ ভালই বুঝেছে যে, এই আহ্বান এমন এক তীর যা জাহেলিয়াতের টার্গেটে আঘাত হানবে এবং তা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। বিপদের এই অনুভূতি থেকে জাহেলিয়াতের সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো এবং তা ফুঁসে উঠল। জাহিলিয়াতের বীর পুরুষরা জাহিলিয়াতের শেষ যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল।

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ـ

'ওদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।' (আল-কুরআন, ৩৮ ঃ ৬)।

এই জীবনের প্রত্যেক সদস্য পরিষ্কার অনুভব করে যে, জাহেলী সভ্যতার প্রাসাদ-সৌধ টলটলায়মান এবং জীবনের গোটা ব্যবস্থাপনাই বিপদের সম্মুখীন। এই সময় শক্তি ও চাপ প্রয়োগ এবং জুলুম ও বাড়াবাড়ির সেই সব লোমহর্ষক ঘটনাবলী সংঘটিত হয় যে সব ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সংরক্ষিত। এটা ছিল এ কথার আলামত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জাহেলিয়াতের ওপর আঘাত হানার জন্য সঠিক টার্গেট নির্বাচন করে ছিলেন এবং তাঁর তীরও সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হেনেছিল। তিনি জাহেলিয়াতের শাহরগের ওপর আঘাত হানেন যদ্দারা জাহেলিয়াত টলমলিয়ে ওঠে এবং সমগ্র আরব জাহেলিয়াতের সম্ভবত সর্ববৃহৎ দুর্গ যুদ্ধের জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর দাওয়াতের ওপর পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় থাকেন। বিরোধিতার তুফান শুরু হয়। ফেতনার ঝড় বন্যার বেগে আছড়ে পড়ে এবং চলেও যায়। কিন্তু তিনি আপন স্থানে থেকে এক বিন্দুও নড়েন নি। তিনি তাঁর চাচাকে পরিষ্কার বলে দেন ঃ

"চাচাজান! আমার ডান হাতে যদি সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেওয়া হয় তবুও এ কাজ আমি পরিত্যাগ করতে পারি না যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা এতে আমাকে সফলতা দান করেন কিংবা আমিই শেষ হয়ে যাই।"[১]

তিনি মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। অবিরত তৌহীদ, রিসালত ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান সুস্পষ্টভাবে জানাতে থাকেন। তিনি এজন্য এতটুকু এদিক-ওদিকের পথ অবলম্বন করেন নি কিংবা বিরোধীদের এতটুকু ছাড় দেন নি আর সময়োপযোগিতার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর আহ্বানের ক্ষেত্রে কোনরূপ আপোসকামিতাকেও প্রশ্রয় দেন নি। এই আহ্বান তথা এই দাওয়াতকেই তিনি সকল রোগের দাওয়াই ও সকল প্রকার বদ্ধ তালার চাবি মনে করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এ সম্পর্কে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা টানাপোড়েনের শিকার হন নি।

প্রথম দিককার মুসলমান

কুরায়শরা এই দাওয়াত ও আহ্বানের মুকাবিলায় হাঁটু গেড়ে বসে এবং জাহেলিয়াতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং ইসলামের রাস্তা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন তথা বিশ্বাস স্থাপন সেইসব সিংহদিল পুরুষ সিংহেরই কাজ ছিল যাঁরা মৃত্যু ভয়ে ভীত নন, যাঁরা আপন ঈমান ও আকীদার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুয়ে পড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যাঁরা দুনিয়ার সর্বপ্রকার লোভ-লালসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কুরায়শদের কতিপয় যুবক সামনে অগ্রসর হলো। এ তড়িঘড়ির ফয়সালা ছিল না এবং যুবকসুলভ ঝোঁকের মাথায় গৃহীত পদক্ষেপও ছিল না। তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরা তাঁদের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছেন এবং জীবনের দরজা নিজেদের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছেন। পার্থিব কোন প্রলোভন এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল না, বরং এই ফয়সালা ছিল কেবল বিপদের দরজা খোলার সমার্থক এবং এর ফলে সর্বপ্রকার পার্থিব স্বার্থ ও আরাম-আয়েশের দরজা বন্ধ হতো। এখানে ছিল কেবল ইয়াকীন ও প্রত্যয়ের এক শক্তি এবং পরকালীন জীবনের লোভ। তাঁরা ঈমানের দিকে আহ্বানকারীদের এই বলে আহ্বান করতে শুনতে পেয়েছিলেন। তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। এই আহ্বান শুনতেই

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৪৩।

বিশাল পৃথিবী তাঁদের জন্য সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে গেল। স্বভাব-তবিয়ত পিষ্ট হতে থাকল। রাতের ঘুম গেল উবে। নরম-কোমল বিছানা কণ্টক শয্যার ন্যায় খচখচ করে বিঁধতে লাগল। তাঁরা দেখল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনা এবং নিজের ঈমানের সাথী হওয়া তাঁদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। তাঁরা তাঁদের দিল ও দিমাগের তথা মন-মস্তিষ্কের ফয়সালা এবং আপন বিশ্বাসের বিরোধিতা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। প্রকৃত সত্য কোনটি তা তাঁদের সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তাঁরা সেই সত্য এড়িয়ে যেতে পারত না। পশু জীবন থেকে তাঁদের মন উঠে গিয়েছিল, বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল তাঁদের মন। তাঁরা আর তাতে নিজেদের মনকে ফাসাতে পারত না। একটি কাঁটা যা তাদের মনে খচখচ করে বিঁধছিল। তাঁরা সেটাকে আর পুষতে পারত না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুতে এবং ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরই মহল্লায় ছিলেন। মাত্র কয়েক গজ দূরে। কিন্তু কুরায়শরা তাঁকে এতটা দূরে ঠেলে দিয়েছিল এবং রাস্তা এতটা বিপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর পর্যন্ত পৌঁছা দূরদরাজ ও অত্যন্ত বিপজ্জনক সফরেরই নামান্তর ছিল। সিরিয়া ও ইয়ামনে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাওয়া এবং আরবের ডাকাতদের হাত থেকে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এতটা কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল না যতটা মক্কার ভেতর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা ছিল কষ্টকর। কিন্তু তাঁরা তাঁর কাছে গেল, তাঁর হাতে হাত মেলাল এবং নিজেদের জীবন তাঁর হাতে তুলে দিল, তাঁকে সোপর্দ করল। তাঁদের জীবনের ভয় ছিল, ভয় ছিল পরীক্ষার সম্মুখীন ও কষ্টের মুখোমুখী হবার। কিন্তু তাঁরা কুরআন শরীফের এই আয়াত শুনেছিল ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

"মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, এই কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (আল-কুরআন, ২৯ ঃ ২-৩)

তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ ও শুনেছিল ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔

"তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নি? অর্থ সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল, এমন কি রসূল ও তাঁর সঙ্গে ঈমানদাররা বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে'? হ্যাঁ, হ্যাঁ,আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই।" (আল-কুরআন, ২:২১৪)

শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের কাছ থেকে যা আশংকা করা গিয়েছিল তাই সামনে এসে দেখা দিল। কুরায়শরা তাদের তূণীরের সব তীরই ঐ অসহায়দের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল এবং সে সবগুলোর পরীক্ষাই তাঁদের ওপর চালায়। কিন্তু তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের মজবুতী এতে আরও বৃদ্ধিই পায়। "আর তারা বলতে থাকে, এই ওয়াদাই তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের সঙ্গে করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যিই বলেছিলেন—আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধিই পেল।" এসব পরীক্ষার ফলে তাঁদের বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়, তাঁদের প্রত্যয় আরও মজবুত, তাঁদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি আরও উন্নত হয় এবং তাঁদের ঈমানে অধিকতর স্বাদ ও মিষ্টতা সৃষ্টি হয়। তাঁদের স্বভাব-চরিত্রে আরও পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা এই অগ্নিকুণ্ড থেকে খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী প্রশিক্ষণ

এরই সাথে সাথে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের কুরআন পাকের রূহানী খোরাক সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন এবং ঈমানের মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের দৈহিক পাক-পবিত্রতা ও অন্তরের ভয়-ভক্তি মিশ্রিত বিনয় শেখাতেন, তার শরীরী প্রকাশ ঘটাতেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সর্বত্র হাজির-নাজির জ্ঞানে প্রত্যহ পাঁচবার তাঁরই সমীপে মাথা ঝোঁকাতেন। তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, দিলের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, প্রবৃত্তি পূজা থেকে মুক্তি লাভ হচ্ছিল। আসমান-যমীনের মালিকের প্রতি ইশ্ক ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি

তাঁদেরকে দুখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা দিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল। তলোয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁদের মজ্জাগত। তাঁরা ছিলেন সে সব গোত্র ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যাঁদের ইতিহাস 'বসূস', 'দাহিস' ও 'গাবিয়া' প্রভৃতি রক্তাক্ত কাহিনী দ্বারা ভরপুর। 'ইয়াওমুল ফিজার'-এর রক্তাক্ত যুদ্ধের স্মৃতিও তখনো অম্লান রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের সেই সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং তাঁদের আরবীয় অহংবোধকে ঈমানী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, তোমাদের হাত সংবরণ কর এবং সালাত কায়েম কর (সূরা নিসা ঃ ৭৭)। তাঁরা রসূল (সা)-এর হুকুমে মোমের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সামান্যতম কাপুরুষতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা সব কিছুই বরদাশত করছিলেন দুনিয়ার কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিগোষ্ঠী যা বরদাশত করেনি। ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করেনি যেখানে কোন মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেছে কিংবা জিঘাংসার আশ্রয় নিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এ এক অনন্য উদাহরণ।

মদীনাতুর রসূলে

কুরায়শরা যখন সীমা অতিক্রম করল তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও তার সাহাবাদেরকে হিজরত তথা দেশত্যাগের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ইয়াছরিবে হিজরত করলেন যেখানে ইসলাম ইতিপূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিল।

মক্কা থেকে আগত মুহাজিররা ইয়াছরিবের লোকদের (আনসার) সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন, অথচ এদের মধ্যে কেবল এই নতুন ধর্ম ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্র ছিল না। ইতিহাসে ধর্মের শক্তি ও প্রভাবের এটিই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ইয়াছরিবের আওস ও খাযরাজ গোত্র বু'আছ যুদ্ধের স্মৃতি তখনও ভোলেনি এবং তাদের খুনপিয়াসী তলোয়ারের রক্ত তখনো শুকোয় নি। এমতাবস্থায় ইসলাম এসে তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করল। এই সন্ধি-সমঝোতার জন্য যদি কোন লোক দুনিয়ার তাবৎ সম্পদও ব্যয় করত তবুও তার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। নবী করীম (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এই ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই মজবুত সম্পর্কের রূপ নেয় যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং দুনিয়ার তাবৎ বন্ধুত্বই তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। ইতিহাসে এ ধরনের নিঃস্বার্থ প্রীতি ও ভালবাসার দ্বিতীয় নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না।

মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারসম্বলিত এই নবোত্থিত জামাতটি ছিল এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর বুনিয়াদ। এই জামাতের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সংকট সন্ধিক্ষণে হয় যখন দুনিয়া জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছিল। এই জামাত এসে তার জীবন-যিন্দেগীর পাল্লাটা ঝুঁকিয়ে দিল এবং সেই সব সমূহ বিপদ দূর করে দিল যা তার সামনে ছিল। এই জামাতের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির দৃঢ় অস্তিত্বের স্বার্থে অপরিহার্য ছিল। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যখন আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির ওপর জোর দিলেন তখন বলেছিলেন, اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ "যদি তা না কর তাহলে ধরাপৃষ্ঠে বিরাট ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দেবে।" (৮ ঃ ৭৩)

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী পূর্ণতা

এদিকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে ও দিক-নির্দেশনায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার সিলসিলা অব্যাহত থাকে। কুরআনুল করীম অব্যাহতভাবে তাঁদের হৃদয়ে উত্তাপ সঞ্চার করতে ও শক্তি জোগাতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈঠক থেকে তাঁদের দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দীর সত্যিকার কামনা এবং এ পথে নিজেদের মিটিয়ে দেবার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, ইল্ম তথা জ্ঞানের প্রতি লোভ ও আকর্ষণ এবং দীনের সমঝ (উপলব্ধি) ও আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ লাভ ঘটে। তাঁরা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করতেন। যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এসব লোক রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দশ বছরে সাতাশ বার জিহাদের জন্য বেরিয়েছেন এবং তাঁর হুকুমে শতাধিক অভিযানে গমন করেছেন। তাঁদের পক্ষে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজসাধ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন করীমের আয়াত সেই সব অসংখ্য বিধান (আহকাম) নিয়ে আসে যা প্রথম থেকে তাঁদের পরিচিত ছিল না। নিজের সম্পর্কে, ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও খান্দান সম্পর্কে আল্লাহ্র আহকাম নাযিল হয় যা পালন করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিটি কথা মেনে নেয়া তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শিরক ও কুফরের গিঁট যখন খুলে গেল তখন আর যেসব গিঁট ছিল সেগুলো হাত লাগাতেই খুলে গেল। আল্লাহ্র রসূল (সা) একবার যখন তাঁদের ঈমানের জন্য মেহনত করলেন, এরপর প্রতিটি

আদেশ-নিষেধ ও প্রতিটি নতুন হুকুমের জন্য স্থায়ী চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত করার আর প্রয়োজন রইল না। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের প্রথম সংঘর্ষে ইসলাম জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করে। এরপর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবার নতুন সংঘর্ষের আর প্রয়োজন অবশিষ্ট রইল না। ঐসব লোক তাঁদের হৃদয়-মনসহ, তাঁদের হাত-পাসহ, নিজেদের রূহ নিয়ে ইসলামের আঁচল তলে এসে গেল। তাঁদের সামনে যখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁদের আর কোন টানাপোড়েন থাকল না, থাকল না কোন সংঘাত। তাঁর সিদ্ধান্তে তাঁদের আর কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিত না। কোন বিষয়ে তিনি যেই সিদ্ধান্ত দিতেন, তাতে তাঁদের এতটুকু মতানৈক্যের অবকাশ থাকত না। এঁরা ছিলেন সেই সব লোক যাঁরা আল্লাহ্র রসূল (স)-এর সামনে নিজেদের গোপন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং কখনো হদযোগ্য পদস্খলনে লিপ্ত হলে নিজেদের দেহকে হদ ও শাস্তির জন্য পেশ করে দিয়েছেন। মদ পান নিষিদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। উথলে ওঠা পানপাত্র হাতে। আল্লাহর হুকুম তাঁদের ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তর, ক্লেদাক্ত ঠোঁট ও পানপাত্রের মাঝে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর কি! হাতের সাহস হয়নি ওপরে ওঠার। তৃষ্ণার্ত ঠোঁট যেখানে ছিল সেখানেই শুকিয়ে গেছে। মদের পেয়ালা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর মদীনার অলিগলি ও নালাগুলোতে মদের স্রোত বয়ে গেছে।

শয়তানের আছর যখন তাঁদের অন্তর-মন থেকে দূরীভূত হলো, বরং বলা উচিত যে, যখন তাঁদের নফসের প্রভাব তাঁদের মন-মানস থেকে অপসৃত হলো, নফসানিয়াত নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে গেল তখন ঐসব লোক নিজেদের সঙ্গে সেই রকমই আচরণ করতে লাগলেন, যেমনটি তাঁরা অন্যের সঙ্গে করতেন। দুনিয়ার বুকে অবস্থান করেও পারলৌকিক জগতের মানুষ এবং নগদ সওদার বাজারে আখিরাতের কর্জকে দুনিয়ার নগদ সওদার ওপর অগ্রাধিকার দানকারীতে পরিণত হলেন। তাঁরা বিপদ-আপদে যেমন ঘাবড়িয়ে যেতেন না, তেমনি কোন নেয়ামত বা অনুগ্রহ পেয়েও ফুলে উঠতেন না। দারিদ্র্য তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সম্পদ তাঁদের ভেতর নাফরমানীকে উস্কে দিতে পারত না। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের গাফিল বা অলস বানাতে পারত না। কোন শক্তিকেই তাঁরা ভয় পেতেন না। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক তাতে দমে যেতেন না। আল্লাহ্র যমীনে দর্পভরে চলার কল্পনাও তাঁরা করতেন না। ভাঙচুর করা কিংবা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার ধারণাও তাঁদের মনে স্থান পেত না। মানুষের জন্য তাঁরা ছিলেন ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড। ইনসাফের ছিলেন তাঁরা পতাকাবাহী।

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী ছিলেন আর সাক্ষ্য স্বয়ং তাঁদের নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেও, এমন কি পিতামাতা ও আত্মীয়-বান্ধবের বিপক্ষে হলেও তাঁরা বিন্দুমাত্র পরওয়া করতেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা যমীনকেই তাঁদের পদতলে নিক্ষেপ করলেন এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁদের করতলে সমর্পণ করলেন। তাঁরা তখন গোটা পৃথিবীরই মুহাফিজ ও আল্লাহ্‌র দীনের দাঈ (আহ্বায়ক)-তে পরিণত হলেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তাঁদেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং নিজে পূর্ণ তুপ্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে রিসালত ও উম্মতের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর রফীকে আ'লা তথা পরম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন।

ইতিহাসের আশ্চর্যতম বিপ্লব ও এর কারণ

মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্রে এই যে বিরাট বিপ্লব যা রসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতময় হাতে সাধিত হলো এবং মুসলমানদের দ্বারা মানব সমাজে সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিল একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, এর গভীরতা, এর বিশালতা ও সর্বজনীনতা, এর বিস্তৃতি ও মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া– এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর ঘটনার অনন্যদিকসমূহ। এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোন জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য হেঁয়ালী ছিল না। জ্ঞানগত পন্থায় এই বিপ্লব সম্পর্কে গবেষণা করুন। মানব ইতিহাসে ও মানব সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন।

ঈমান ও এর প্রভাব

আরব-অনারব নির্বিশেষে সকলেই অত্যন্ত বিকৃত জীবন যাপন করছিল। এমন প্রতিটি সত্তা যা তার সেবার জন্য পয়দা করা হয়েছিল, অস্তিত্ব লাভ করেছিল কেবল তার জন্য এবং যা ছিল তারই অধীন, যেভাবে চাইবে ব্যবহার করবে, আদেশ-নিষেধ, শাস্তি দান কিংবা পুরস্কার প্রদানের একবিন্দু ক্ষমতা নেই যার– সে সবের তারা পূজা-অর্চনা করতে শুরু করেছিল। তারা একেবারেই ভাসাভাসা ও বিক্ষিপ্ত একটি ধর্মে বিশ্বাসী ছিল, জীবন-যিন্দেগীতে যার কোন প্রভাব বিংবা তাদের স্বভাব-চরিত্রে, হৃদয়-মনে ও আত্মার ওপর যার কোন ক্ষমতা ছিল না।

চরিত্র ও সমাজ এই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিল না। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তাদের দৃষ্টিতে এমন ছিল যেমন একজন শিল্পী কিংবা কারিগর তার কাজ

শেষ করে সরে পড়েছে এবং নির্জনতা বেছে নিয়েছে। তাদের ধারণায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাম্রাজ্য সেই সব লোকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাদেরকে তিনি রবূবিয়তের খেলাত দ্বারা ধন্য করেছিলেন। এখন তারাই ক্ষমতাসীন এবং সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। জীবিকা বন্টন, রাজ্যের আইন-শৃংখলা রক্ষা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তাদের এখতিয়ারাধীনে। মোটের ওপর একটি সুসংহত ও সুশৃংখল হুকুমতের যতগুলো শাখা ও বিভাগ হয়ে থাকে তার সবই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন।

আল্লাহ তা'আলার ওপর তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আল্লাহকে প্রভু-প্রতিপালক মনে করা, তাঁকে আসমান-যমীনের স্রষ্টা মানা তেমনই ছিল যেমন ইতিহাসের কোন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই প্রাচীন ইমারতটি কে নির্মাণ করেছিলেন? ছাত্রটি উত্তরে কোন বাদশাহ্‌র নাম বলল। বাদশাহ্‌র নাম বলার দ্বারা তার দিলের ওপর কোনরূপ ভয়-ভীতি যেমন দেখা দেবে না, তেমনি তার মস্তিষ্কের ওপর এর কোন প্রভাবও পড়বে না। এসব লোকের হৃদয় আল্লাহ তা'আলার ভয়, বিনয়মিশ্রিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও দো'আ থেকে শূন্য ছিল। আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ-বেখবর ছিল। এজন্য তাদের দিলে তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর আজমত ও বড়ত্বের কোন চিত্র ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের খুবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা ধারণা ছিল যার ভেতর কোন গভীরতা ও শক্তি ছিল না।

গ্রীক দর্শন আল্লাহ তা'আলার সত্তার পরিচিতির ধারাবাহিকতায় বেশির ভাগ নেতিবাচক পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। সে তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং এর দীর্ঘ ফিরিস্তি কায়েম করেছে যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কোন 'হ্যাঁ'বাচক প্রশংসা এবং কোন ইতিবাচক গুণ নেই। তাঁর কুদরতের উল্লেখও এতে নেই, নেই এতে তাঁর রবূবিয়তের কথা কিংবা আলোচনা। তাঁর সীমাহীন অনুদান, তাঁর অপরিমেয় প্রেম-ভালবাসা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাও এতে নেই। এই দর্শন 'প্রথম সৃষ্টি' তো প্রমাণ করেছে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও এখতিয়ার এবং ইচ্ছা ও গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং নিজের পক্ষ থেকে এমন সব মূলনীতি তৈরি করেছে যা সেই মহান সত্তাকে খাটোকরণ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের ওপর অনুমান নির্ভর করে প্রণীত। আর একথা তো পষ্ট যে, শত শত নেতিবাচক মিলেও একটি ইতিবাচকের সমান হতে পারে না।

আমাদের জানা মতে, আজ পর্যন্ত এমন কোন সুশৃংখল নীতি কিংবা বিধান, এমন কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং এমন কোন সমাজ জন্ম নেয়নি যা কেবল

নেতিবাচক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীক দর্শনের প্রভাবাধীন মহলে ধর্ম ও মতাদর্শ ভয়-ভীতি মিশ্রিত বিনয় ও শ্রদ্ধা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের দিকে মনোনিবেশ, প্রেম ও ভালবাসার রূহ থেকে একদম শূন্য ছিল। ঠিক তদ্রূপ সেই যুগের বিভিন্ন ধর্মও প্রাণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং কতকগুলো নিষ্প্রাণ আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাণহীন অনুকরণসর্বস্ব প্রথা-পার্বণেই পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহ ও আরব জাতিগোষ্ঠী এই অসুস্থ, অস্পষ্ট ও নিষ্প্রাণ পরিচিতির আবহ থেকে বেরিয়ে এমন এক সুস্পষ্ট ও গভীর আকীদা-বিশ্বাস অবধি গিয়ে পৌঁছে যায় যার নিয়ন্ত্রণ ছিল হৃদয়-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর, যা সমাজকে প্রভাবিত করার মত জীবন-যিন্দেগী ও জীবনের নানা অনুষঙ্গের ওপর জেঁকে বসা। ঐ সব লোক এমন এক পবিত্র সত্তার ওপর ঈমান এনেছিলেন যাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নাম, সর্বোচ্চ শান। তাঁরা এমন রাব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান এনেছিলেন যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু, কিয়ামত দিবসের নিরংকুশ মালিক-মুখতার ও রাজাধিরাজ।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- هُوَ اللّٰهُ الْخٰلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; ওরা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কুরআন, ২৮:২২-২৪)

যিনি এই বিশাল জগত ও বিশ্ব কারখানার স্রষ্টা ও মালিক এবং পরিচালনাকারী, যাঁর কুদরতী কবজায় তামাম বিশ্বজাহানের বাগডোর। যিনি আশ্রয় দেন, আর তাঁর মুকাবিলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। জান্নাত তাঁর পুরস্কার এবং জাহান্নাম তাঁর শাস্তি। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকুচিত করেন। আসমান-যমীনের সকল গুপ্ত বিষয় তিনি জানেন। চোখের গোপন চাউনি ও দিলের নিভৃত কন্দরে লুকায়িত রহস্য তিনিই সম্যক অবগত। তিনি সৌন্দর্য, পূর্ণতা, ভালবাসা ও দয়ামায়ার আধার।

এই গভীর, বিশাল-বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ঈমানের দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের মন-মানসিকতার আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন ঘটে। কেউ যখন আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনত এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দিত অমনি তার জীবনে এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হতো। তার ভেতর ঈমান অনুপ্রবিষ্ট হতো, য়াকীন তার শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতো এবং তার শরীরে রক্ত ও প্রাণ-সঞ্জীবনীর ন্যায় দ্রুত সঞ্চালিত হতো। জাহেলিয়াতের বীজাণুগুলোকে খতম করে দিত এবং জড়ে মূলে উৎখাত করে ছাড়ত। মন-মস্তিষ্ক এর ফয়েয দ্বারা মণ্ডিত হতো এবং সেই লোকটি আর পূর্বের ন্যায় থাকত না। এই লোকের দ্বারা ধৈর্য, শৌর্যবীর্য ও ঈমান-য়াকীনের এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হতো যে, আক্কেল গুড়ুম হবার মত এবং দর্শন ও নৈতিকতার ইতিহাস বিস্ময়ে বোবা বনে যাবে। ঈমানী কুওত ছাড়া এর আর কোন হেতু বা ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের ভর্ৎসনা

এই ঈমান ছিল নৈতিকতার একটি সফল মাদরাসা ও মানসিক প্রশিক্ষণ যা শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ মানের ইচ্ছাশক্তি, আত্মসমালোচনা এবং স্বয়ং নিজের প্রতি সুবিচারের শক্তি দান করত। ইতিহাসে এমন কোন শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না যা মনের চাহিদা ও নৈতিক পদস্খলনের ওপর এরূপ সফলতার সঙ্গে জয়লাভ করেছে।

যদি কোন সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষের দ্বারা ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটে যখন কোন মনুষ্য চক্ষু তা দেখতে পায় না এবং সংশ্লিষ্ট লোকটিকে আইনের ধারা-উপধারা আটকাতে অক্ষম হয়, এই ঈমানই তখন তীব্র ভর্ৎসনাকারী 'নফসে লাওয়ামায়' পরিণত হয়, দিলের ফাঁস তাঁর পায়ে গিয়ে তাকে চলৎশক্তিহীন করে দেয়, পেরেশানকারী ধ্যান-ধারণা

বন্যার বেগে তার মস্তিষ্কের ওপর আছড়ে পড়ে। গোনাহর স্মরণ ও স্মৃতি এমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি উবে যায়। এমন কি লোকটি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় নিজেকে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে পেশ করতে। সে নিজেই কৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি করে এবং কঠিন শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করে। এরপর নির্ধারিত শাস্তি সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং হাসিমুখে শাস্তি সইতে থাকে যাতে করে সে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারে এবং আখিরাতের স্থলে দুনিয়াতেই শাস্তিটা ভোগ করে নিতে পারে।

আমাদের সামনে বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা তাদের লিখিত ইসলামের ইতিহাসে পেশ করেছেন যার নজীর ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাস ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এসব ঘটনার মধ্যেই মা'ইয ইব্‌ন মালিক আসলামীর ঘটনা অন্যতম। ঘটনাটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। মাইয রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপরাধ করে ফেলেছি, আমি যেনা করেছি। আমি চাই, আপনি আমাকে পরিশুদ্ধ করে দেবেন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন আবার তিনি এলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যেনার অপরাধে অপরাধী। আমাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁকে আবারও ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর পরিবারের লোকদের থেকে জানতে চাইলেন তাঁর মাথায় কোনরকম ছিট বা গোলমাল আছে কিনা। তারা উত্তরে জানায় যে, তাদের জানামতে মা'ইয অত্যন্ত সমঝদার মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এরপর মা'ইয (রা) তৃতীয়বারের মত রসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আগমন করেন এবং ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমা দ্বারা যেনার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আমাকে আপনি পাক করে দিন। রসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে একই রূপ তথ্য পেলেন। চতুর্থবার স্বীকৃতির পর তাঁর অর্ধেক দেহ মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যার নির্দেশ দেন।[১]

এর পরবর্তী ঘটনা গামিদিয়া (রা) [নামক মহিলা সাহাবী]-র। তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যেনা করে ফেলেছি। আমাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-হুদূদ।

পরদিন মহিলা আবার আসেন এবং বলতে থাকেন, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন? সম্ভবত সেভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন যেভাবে মা'ইযকে ফিরিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, আমি গর্ভবতীও বটে। আল্লাহ্‌র রসুল তাঁকে বললেন, তুমি এখন ফিরে যাও। সন্তান প্রসবের পর এস। সন্তান প্রসবের পর মহিলাটি পুনরায় আসলেন। শিশু কাপড়ে জড়ানো ছিল। তিনি শিশুটাকে দেখিয়ে বলেন, "এটাই আমার বাচ্চা।" নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, "যাও, ওকে দুধ পান করাও গিয়ে। যখন সে খাবার খাওয়া শুরু করবে তখন এস।" এরপর কোলের শিশুটি যখন দুধপান ত্যাগ করল তখন মহিলা আবার এলেন। শিশুটির হাতে তখন রুটির টুকরা। তিনি বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী! এই নিন, বাচ্চা আমার দুধপান ছেড়ে দিয়েছে আর আমি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। সে এখন খাবার খেতে পারে।" আল্লাহ্‌র নবী শিশুটাকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন এবং মহিলার ওপর শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। তাঁর বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো। তিনি নির্দেশ দিতেই সকলে মিলে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করল। খালিদ (রা) ইবনু'ল-ওলীদ একটি পাথর নিক্ষেপ করলে রক্তের ছিটা এসে তাঁর মুখমণ্ডলে লাগে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মহিলাটিকে কিছু অশোভন কথা বলেন। আল্লাহ্‌র নবী (সা) একথা শুনতেই খালিদ (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "খালিদ! সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন। সে এমন তওবা করেছে যদি এমন তওবা করত রাজস্ব আদায়কারীরা তাহলে তারা সকলেই ক্ষমা পেয়ে যেত।" এরপর রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে গামিদিয়া (রা)-এর জানাযা ও দাফন কাফন করা হয়।।[১]

আমানত ও দিয়ানত (সততা ও আমানতদারী)

এই ঈমান ছিল মানুষের আমানত, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ। নির্জনে ও জনসমাবেশে তথা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যেখানে দেখার মত কেউ থাকত না, এমন জায়গা যেখানে একজন মানুষের যা খুশি করবার পূর্ণ সুযোগ থাকে, যেখানে কাউকে ভয় করার কিংবা কারোর থেকে ভয় পাবার ছিল না। এই ঈমান প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনার ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখত। ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, আমানতদারী ও ইখলাসের এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানব ইতিহাসে এর নজীর মেলা ভার। এ কেবল সুদৃঢ় ঈমান

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-হুদূদ।

ও আল্লাহ্‌র ধ্যান এবং সর্বত্র ও সর্বক্ষণ তাঁর অবগতির চেতনারই ফসল ছিল। ঐতিহাসিক তাবারী বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন ইরানের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছল এবং মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল তখন এক ব্যক্তি তার সংগৃহীত ধনরত্ন নিয়ে এল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট সোপর্দ করল। লোকেরা বলল, এমন মূল্যবান সম্পদ তো আমরা কখনো দেখি নি। আমরা যা সংগ্রহ করেছি এর তুলনায় সেগুলোর কোন মূল্যই নেই। এরপর লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এর থেকে কিছু রেখে আসনি তো? লোকটি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলল, ব্যাপারটা যদি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত না হতো তা হলে তোমরা এ সবের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারতে না। লোকেরা বুঝতে পারল, এ কোন মামুলী লোক নন। তারা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। লোকটি জানাল, আমি বলতে পারব না এজন্য যে, তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি এ কাজের জন্য যদি কোন ছওয়াব দিতে চান আমি কেবল তাতেই রাজী। তিনি চলে গেলে তাঁর পরিচয় জানার জন্য তাঁর পেছনে একজন লোক পাঠানো হয়। জানা গেল, তাঁর নাম আমের, তিনি আবদে কায়স গোত্রের লোক।[১]

সৃষ্টিকুল ও প্রদর্শনীর প্রতি নিস্পৃহতা ও নিঃশংকচিত্ততা

তৌহিদী আকীদা-বিশ্বাস তাঁদের মাথা উঁচু করে দিয়েছিল আর গর্দান করে দিয়েছিল উন্নত। গায়রুল্লাহ্‌র সামনে কিংবা অত্যাচারী বাদশাহ্‌র সামনে অথবা আলিম-উলামা, পীর-দরবেশ কিংবা ধর্মীয় ও জাগতিক নেতৃত্বের অধিকারী কোন ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁদের এই উন্নত গর্দান ও উচ্চ মস্তক অবনমিত হবে–এর কল্পনাও ছিল অসম্ভব। এই ঈমান ও ঈমানী চেতনা তাঁদের দিল ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলার আজমত ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সৃষ্টিকুলের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, দুনিয়ার চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ ও শান-শওকতের প্রদর্শনী তাঁদের দৃষ্টিতে কোন মূল্যই বহন করত না। তাঁরা যখন রাজা-বাদশাহ, তাদের জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে তাকাত এবং দেখতে পেত, এসব রাজা-বাদশাহ এসবেই পরম তুষ্ট, তখন তাঁদের মনে হতো, কতিপয় নিষ্প্রাণ ভাস্কর্য কিংবা মাটির তৈরী মূর্তি যাদেরকে মানুষের পোশাক পরিয়ে সাজানো হয়েছে।

১. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৬ পৃ.।

আবু মূসা বলেন, আমরা যখন নাজাশীর কাছে গেলাম তখন তাঁর দরবারের অধিবেশন চলছিল। ডান দিকে ছিল (কুরায়শ দূত) আমর ইবনু'ল-আস এবং বাম দিকে আম্মারাহ। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দো-সারিতে উপবিষ্ট। আমর ও আম্মারাহ বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) কাউকে সিজদা করে না। পাদ্রীরা এর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের বলল বাদশাহকে সিজদা করতে। হযরত জা'ফর (রা) তাৎক্ষণিক জওয়াবে বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে সিজদা করি না।[১]

হযরত সা'দ (রা) পারসিক সেনাপতি রুস্তমের কাছে রিবঈ ইবন আমের (রা)-কে তাঁর দূত নিযুক্ত করে পাঠান। রিবঈ ইবন আমের (রা) গিয়ে দেখতে পান, দরবার মূল্যবান গালিচা দ্বারা সজ্জিত এবং স্বয়ং রুস্তম দামী ইয়াকূত ও মণি-মুক্তাখচিত মহামূল্যবান পোশাক পরিধান করে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। তার মস্তকে দামী মুকুট শোভা পাচ্ছে। রিবঈ ইবন আমের (রা) যখন রুস্তমের দরবারে যান তখন তাঁর পরনে ছিল পুরনো সাধারণ পোশাক, সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর ছোট্ট একটি ঘোড়া। তিনি ঘোড়ায় চড়ে গালিচা মাড়িয়েই সামনে অগ্রসর হন। এরপর তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। তিনি মূল্যবান সোফার সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিজে রুস্তমের দিকে অগ্রসর হন। সাথে যুদ্ধাস্ত্র, শিরোপরি লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং শরীরে বর্ম পরিহিত। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে সামরিক পোশাকাদি খুলে ফেলতে বলে। তিনি উত্তরে জানান, আমি তোমাদের কাছে নিজে থেকে আসি নাই। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছ। আমার এ বেশে আগমন যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে আমি এখনই ফিরে যাচ্ছি। রুস্তম তখন তার লোকদের বাধা দিয়ে বললেন, তাঁকে আসতে দাও। তিনি পাতা ফরাশের ওপর বর্শায় ভর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে বর্শার অগ্রভাগের চাপে স্থানে স্থানে গালিচা ফুটো হয়ে যায়। দরবারীরা জিজ্ঞেস করে, তোমরা এদেশে কিজন্য এসেছ? তিনি উত্তর দেন, "আল্লাহ পাক আমাদের এজন্যই পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁরই ইচ্ছানুক্রমে তাঁর বান্দাদেরকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র দাসত্বে ন্যস্ত করতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে কৃত জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করে ইসলামের সুবিচারের ছায়াতলে টেনে নিই।"[২]

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবন কাছীর, খণ্ড. ৩, পৃ. ৬৭।
২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাছীরকৃত, খ. ৭, পৃ. ৪০।

নজীরবিহীন বীরত্ব ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহ

পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয়ে এমন নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এক কথায় যা ছিল বিস্ময়কর! তা তাঁদেরকে জান্নাতের প্রতি আশ্চর্য রকমের আগ্রহশীল এবং জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ করে দিয়েছিল। জান্নাতের ছবি তাঁদের চোখের সামনে এমনভাবে ভেসে উঠত যে, যেন বাস্তবে তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করছে। তাঁরা সেই জান্নাতের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যেমন পত্রবাহক কবুতর ওড়বার সময় কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সোজা মনযিলে গিয়েই দম নেয়।

ওহুদ যুদ্ধে যখন বহু মুসলমানই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিল তখন আনাস ইবন নযর (রা) অগ্রসর হন। সামনেই তিনি হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-কে দেখতে পান। তিনি হযরত সা'দ (রা)-কে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, ওহে সা'দ (রা)! আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি ওহুদ পাহাড়ের অপর পাশ থেকে ভেসে আসা জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, (শাহাদত লাভের পর) আমরা তাঁর শরীরে আশিটির বেশি জখম দেখতে পেয়েছি। এসব জখমের কোনটি ছিল তলোয়ারের, কোনটি বল্লমের, আবার কোনটি ছিল তীরের। আমরা তাঁকে এ অবস্থায় দেখি, তাঁর দেহ কাফির মুশরিকদের আঘাতে আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁকে চেনার উপায় ছিল না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙুল দেখে তাঁকে চিনতে সক্ষম হন।[১]

বদর যুদ্ধে যখন রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত। উমায়র ইবন হাম্মাম (রা) নামক জনৈক আনসারী সাহাবী বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের প্রশস্ততা যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেন? তোমার কি এতে সন্দেহ হচ্ছে? আনসারী বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশা, যদি তা আমি পেতাম! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তা পাবে। এরপর এই সাহাবী তাঁর থলে থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। এরপর তিনি বলে উঠলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলো খাবার জন্য অপেক্ষা করি তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। এই বলে তিনি বাকি খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদত লাভ করলেন।[২]

১. বুখারী ও মুসলিম।
২. মুসলিম।

আবূ বকর ইবন আবূ মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, আমার পিতা ছিলেন শত্রুর মুখোমুখি। তিনি বলছিলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত। তা শুনে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তার শরীরের কাপড়-চোপড় ছিল জীর্ণশীর্ণ। সে বলল, আবূ মূসা! তুমি কি নিজে আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-কে এই কথা বলতে শুনেছ? তিনি জানালেন, হ্যাঁ, শুনেছি। তখন সেই লোকটি তার সাথীদের কাছে ফিরে গেল এবং তাদের বলল, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ করো। এরপর তিনি তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেলে দিয়ে কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে দুশমনের মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।[১]

আমর ইবন জামূহ্‌র ছিল চার পুত্র। তিনি খোঁড়া ছিলেন বিধায় পা খুঁড়িয়ে চলতেন। রসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে গমন করলে তাঁর চার পুত্রই এতে যোগদান করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী হতেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হবার কালে আমর ইবন জামূহ (রা) এতে যোগ দেবার জন্য বায়না ধরে বসেন। পুত্ররা তাদের পিতাকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন, আল্লাহ তা'আলা তো এ ব্যাপারে আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আপনি না গেলেই ভাল হয়। আপনার পক্ষ থেকে আমরাই তো যথেষ্ট। আল্লাহ পাক জিহাদে যোগদানের দায়িত্ব থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আমর ইবন জামূহ (রা) আল্লাহর রসূলের খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এসব ছেলে আমাকে আপনার সঙ্গী হতে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমার দিলের বাসনা, আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতের বুকে চলাফেরা করি। আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে জিহাদে যোগদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এরপর ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তাকে যেতে দিচ্ছ না কেন? হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শাহাদত দান করবেন। এরপর আমর (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গমন করেন এবং শাহাদত লাভ করেন।[২]

শাদ্দাদ ইবন হাদ বলেন, একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সাথী হলো। তারপর সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে হিজরত করব। নবী করীম (সা) একজন সাহাবীকে তার প্রতি খেয়াল রাখতে বললেন। খয়বরের যুদ্ধ এসে হাজির হলে যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

১. মুসলিম।
২. যাদুল-মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।

বণ্টন করেন। উল্লিখিত বেদুঈনকেও বণ্টিত একটি অংশ দেবার জন্য সাহাবাদের হাতে তুলে দেন। বেদুঈন সকলের পশুপাল চরাত। সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর যখন তাকে তার অংশ প্রদান করা হলো তখন সে এটা কিসের কি জিজ্ঞেস করল। লোকে বলল, মালে গনীমত ভাগ করার সময় রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকেও একটি অংশ দিয়েছেন। সে এটা হাতে নিয়ে সোজা আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলো এবং জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি? তিনি বললেন, তোমার অংশ। সে বলল, আমি তো এর জন্য আপনার সাথী হই নি। আমি তো আপনার সাথী হয়েছিলাম যাতে করে আমার এখানে তীর লাগে, এই বলে সে কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করল, আর আমি জান্নাতে যেতে পারি। তিনি বললেন, যদি আল্লাহর সঙ্গে তোমার কারবার সত্য হয় তাহলে তিনিও তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। এরপর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি ঐ বেদুঈনের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন সে শহীদ হয়ে পড়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, একি সেই লোক ? সকলেই বলল, জী হ্যাঁ, সেই বেদুঈনটিই। বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে তার কারবার সত্য ছিল, আল্লাহও তার আকাঙ্ক্ষাকে সত্য করে দেখিয়েছেন।[১]

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ

এরা সকলেই এই ঈমান কবুলের আগে কী বিশৃংখল জীবন যাপন করছিল! তারা না কোন শক্তির সামনে মাথা নত করত, আর না কোন জীবন-বিধানের ধার ধারত। তারা কোন জীবন পদ্ধতির সঙ্গেই জড়িত ছিল না। তারা একমাত্র প্রবৃত্তির অনুগত ছিল। না বুঝেই তারা আমল করত। গোমরাহীর অন্ধকারে তারা হাতড়ে ফিরত। এখন তাঁরা ঈমান ও গোলামির এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, তাঁদের জন্য এর বাইরে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য, গোলাম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। পরিপূর্ণরূপে তাঁর সমীপে নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সঁপে দিয়েছিল। কানূনে ইলাহী তথা খোদায়ী বিধানকে নিঃশর্তে মেনে নিয়েছিল এবং নিজেদের কামনা-বাসনা ও মাতব্বরী ফলানো থেকে পরিপূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। তাঁরা এমনভাবে গোলামে পরিণত হয়েছিল যে, তাঁরা না নিজেদেরকে নিজেদের সম্পদেরই

১. যাদুল-মাআদ, ২য় খণ্ড, ১৯ পৃ.।

মালিক মনে করত, আর না মালিক মনে করত নিজের জানের যে মালিকের মর্জি ও অনুমতি ছাড়া সামান্যতম এখতিয়ারও প্রয়োগ করতে পারে না। তাঁদের যুদ্ধ ও সন্ধি-সমঝোতা, শত্রুতা ও বন্ধুত্ব, অনুরাগ ও বিরাগ, দেওয়া ও না দেওয়া, আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সব কিছুকেই আল্লাহ্র হুকুমের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা যাই কিছু করত তাঁর হুকুম মাফিক করত। তাঁরা জাহেলিয়াত সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। এরই ভেতর তাঁরা লালিত-পালিত ও বয়োপ্রাপ্ত হয়েছিল। এজন্যই তাঁরা ইসলামের মর্ম খুব ভালই বুঝত। তাঁদের বেশ ভালই জানা ছিল, ইসলামের নামই হলো এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া। এক দিকে বান্দার রাজত্ব অথবা কেবলই নৈরাজ্য আর অপর দিকে আল্লাহর হুকুমত। গতকালও আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ-সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল এবং তাঁর আইন, তাঁর কানূন ও তাঁর বিধানের সঙ্গে সংঘাত চলছিল আর আজ (ইসলাম গ্রহণের পর) পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য এবং স্থায়ী সন্ধি ও সমঝোতা। কাল পর্যন্ত ছিল আমার আর আমার, আমিত্বের অহংকার আর এখন আল্লাহ্র গোলামি ও দাসত্ব। যখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এরপর আর আমার, আমিত্ব বা মতামত বলতে কিছু নেই, নেই স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোন কাজ বা কর্ম। এখন আর আল্লাহ্র হুকুম থেকে মুখ ফেরাবার কিংবা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহর হুকুমের পর আমার নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ খাড়া করা কিংবা তর্ক-বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। গায়রুল্লাহর সামনে মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না কিংবা নিজস্ব খেয়াল-খুশি মুতাবিক ফয়সালা হতে পারবে না। দীনের মুকাবিলায়, ইসলামের মুকাবিলায় রসম-রেওয়াজের পাবন্দী করা যাবে না। তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর নফস পরস্তী তথা আত্মপূজাও অবশিষ্ট থাকতে পারে না। যখনই সে ইসলাম গ্রহণ করল তখনই জাহেলী জীবনের তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য, আচার-অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজসহ পরিত্যাগ করল এবং ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করল। এর ফলে তার জীবনে এতটুকু বিলম্ব ছাড়াই পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হলো।

ফুযালা ইবন উমায়র ইবন মিলওয়াহ আল্লাহ্র রসূল (সা)-কে শহীদ করতে মনস্থ করে। রসূল (সা) তখন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। ফুযালা কাছে আসতেই তিনি বললেন, ফুযালা নাকি হে? সে উত্তরে বলল, জী হ্যাঁ, আমি ফুযালা ইয়া রাসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কী মনে করে এসেছ আর কি

ভাবছ? সে বলল, কৈ না, কিছু মনে করে নয়। আমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছিলাম। রসূল (সা) বললেন, আল্লাহর কাছে তওবা কর। এরপর তিনি তাঁর মুবারক হাত তার বুকের ওপর রাখলেন। এতে তাঁর হৃদয়-মন অপূর্ব তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভরে গেল। ফুযালা (মুসলমান হবার পর) বলতেন, নবী করীম (সা)-এর হাত আমার বুকের ওপর থেকে উঠতেই তাঁকে আমার কাছে এমন প্রিয় মনে হতে লাগল যে, তাঁর চাইতে অধিক প্রিয় আল্লাহ তা'আলা সমগ্র দুনিয়াতে আর কাউকে সৃষ্টিই করেন নি। ফুযালা বলেন, ফেরার পথে পথিমধ্যে এক মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় যার সঙ্গে আমার পূর্ব সম্পর্ক ছিল। সে আমাকে দেখে একটু নিরিবিলিতে আলাপ জমাতে চাইল। আমি তাকে বললাম, এখন আর তা হয় না। আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলাম গ্রহণের পর এখন আর এর কোন সুযোগ বা অবকাশ নেই।[১]

সঠিক পরিচিতি ও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞান

আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম মানুষকে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী ও তাঁর যাবতীয় কাজকর্মের সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিলেন। এই বিশ্বজগতের সূচনা ও চূড়ান্ত পরিণতি এবং মৃত্যুর পর মানুষ যার মুখোমুখি হবে সে সবের জ্ঞান আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের মাধ্যমে মানব জাতি পর্যন্ত কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ও আয়াস ছাড়াই পৌঁছেছে। আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম এমন সব জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের পথ দেখিয়েছেন যে সবের মূলনীতি ও মূলভিত্তির প্রাথমিক জ্ঞানও তার ছিল না যার ওপর এই মানুষ তার গবেষণার প্রাসাদ দাঁড় করাতে পারে। আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম মানুষের সময় ও শক্তি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, অধিবিদ্যাগত সেই নিষ্ফল ও অর্জনাতীত অনুসন্ধান ও গবেষণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন যেক্ষেত্রে না তার ইন্দ্রিয় শক্তি তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারত আর না দিতে পারত তার দৃষ্টি কোন পথের সন্ধান, আর না তার কাছে এ বিষয়ক কোন মৌলিক জ্ঞানই বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু মানুষ এই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। সে এক অপ্রয়োজনীয় অভিযানের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিল। যেই হাকীকত তথা মৌলিক সত্য আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের মাধ্যমে সে অনায়াসে ও বিনা প্রয়াসে লাভ করেছিল সে তা নিয়ে আবার গোড়া থেকে গবেষণা শুরু করল এবং

১. যাদুল-মা'আদ, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.।

সেই অজানা দ্বীপাঞ্চল ও ভূখণ্ড চষে বেড়াতে লাগল যার কোন পথ-প্রদর্শক তার সাথে ছিল না কিংবা এমন কেউ ছিল না যে এ পথ সম্পর্কে অবহিত। এ ব্যাপারে সে সেই অভিযাত্রীর চাইতেও বেশি দুর্ভাগা ও বাহুল্যপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে যে সে সব জ্ঞাত বিষয় ও গবেষণাতেই সন্তুষ্ট নয় যা ভূগোল ও মানচিত্র আকারে কয়েক প্রজন্মের ও শতাব্দীর পর শতাব্দীর শ্রমের ফসল। সে প্রয়াস চালাচ্ছে পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতা নতুন করে মাপতে। প্রান্তর-ময়দান, দূর-দূরান্ত ও সীমান্তসমূহ তার এই সংক্ষিপ্ত বয়স ও সীমাবদ্ধ উপায়-উপকরণ নিয়ে আরেকবার যুক্ত ও সম্পৃক্ত করতে। এই মানুষটির চেষ্টা ও শ্রমের পরিণতি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, অবশেষে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বসে পড়বে। তার অটুট সংকল্প ও মনোবল জওয়াব দিয়ে বসবে এবং সেই ব্যক্তি কেবল গুটি কয়েক স্মারক ও অপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিতের কিছু পুঁজি সংগ্রহ করবে। এর চেয়ে বেশি যে সমস্ত লোক খোদায়ী দর্শনের ময়দানে অন্তর্দৃষ্টি ও আলোক-রশ্মি ব্যতিরেকেই পা রেখেছে তাদের জ্ঞানের এই ময়দানে পরস্পরবিরোধী মত, অপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্য, আকস্মিক ধ্যান-ধারণা ও তাড়াহুড়ার দর্শন ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাবে না। নিজেরাও পথ হারাল আর অন্যদেরও বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করল।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) দীন সম্পর্কে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও তৌফীকপ্রাপ্ত ছিলেন যে, দীন সম্পর্কে তাঁরা রসূলুল্লাহ সো)-এর তা'লীম ও প্রদত্ত তথ্যের ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে 'আকাশ কুসুম স্বর্গ তৈরির' ব্যর্থ চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা তাঁদের মেধা ও শক্তিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখেন এবং নিজেদের যাবতীয় প্রয়াস, চেষ্টা-সাধনা ও সময়কে পূর্ণ সতর্কতার সাথে দীন ও দুনিয়ার উপকারী ক্ষেত্রে ব্যয় করেন। তাঁরা দীনের মযবূত বৃত্তকে আঁকড়ে থাকেন। ফল দাঁড়াল এই যে, যদি অন্যের কাছে দীন সম্পর্কিত বিষয়াদি ও বিস্তৃত বিবরণ থাকে, তবে তাঁদের কাছে ছিল দীনের মগজ ও এর সারাৎসার।

মানবীয় পুষ্পডালি

আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পারলৌকিক জীবনের ওপর বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ জীবনের জটিলতাকে দূর করে দিল এবং মানব পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে তার যথার্থ স্থান দান করল। মানব সমাজ একটি কণ্টকমুক্ত ফুলের ডালিতে পরিণত হলো যার প্রতিটি ফুল ও প্রতিটি পত্র তার জন্য সৌন্দর্যবর্ধক ছিল।

মানব জাতির সদস্যবর্গ একটি পরিবারে পরিণত হলো। তারা ছিল সকলেই একই পিতা (আদম)-এর সন্তান আর আদমের উৎপত্তি মাটি থেকে। আরবের কারোর অনারবের ওপর যেমন কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ছিল না, তেমনি কোন অনারবেরও কোন আরবের ওপর প্রাধান্য ছিল না। তবে হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা থাকলে তা ছিল কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে, কে কতটা আল্লাহভীরু তার ভিত্তিতে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

"লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের মিথ্যা অহমিকার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করার প্রথাও খতম করে দিয়েছেন। মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ একশ্রেণী যারা সৎ ও আল্লাহকে ভয় করে আর এরাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে শরীফ হিসেবে বিবেচিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা যারা বদকার ও বদবখ্ত (অসৎ ও হতভাগা), আল্লাহ তা'আলার দরবারে যারা হেয় ও লাঞ্ছিত হিসেবে পরিগণিত।[১]

হযরত আবূযর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) তাঁকে বলেনঃ দেখ, তুমি কারো থেকে উত্তম নও এবং বড়ও নও। তবে হ্যাঁ, যদি তাকওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পার (তাহলে অবশ্যই বড়)।

তিনি যখন রাত্রের শেষভাগে আপন প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করতেন তখন বলতেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সমস্ত মানুষই ভাই ভাই।"[২]

নবী করীম (সা) জাহেলিয়াত-এর পরিপূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং এর অনুপ্রবেশের সমস্ত ফাঁকফোকর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায় গোত্রপ্রীতি, সম্প্রদায়প্রীতি ও জাতীয়তাপ্রীতির ঝাণ্ডাবাহী হবে সে আমাদের কেউ নয় এবং যে এ নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেও আমাদের কেউ নয় এবং যে এতে মারা যাবে সেও আমাদের কেউ নয় (অর্থাৎ মুসলমান নয়)।"[৩]

জাবির ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। একজন মুহাজির জনৈক আনসারীকে ভালমন্দ কিছু বলে ফেলেন। এতে আনসারী চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, 'হে আনসাররা! আমার সাহায্যে এগিয়ে এস।' ওদিকে মুহাজিরও

১. ইবনে আবী হাতিম;
২. আবূ দাঊদ।
৩. আবূ দাঊদ;

চিৎকার দিয়ে ডেকে ওঠেন, 'ওহে মুহাজিররা! আমার সাহায্যে এগিয়ে এস।' ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) এসে হাজির হন এবং উভয়কে লক্ষ করে বলেন: "তোমরা এই যূথবন্দীর শ্লোগান পরিত্যাগ কর। কেননা এ নাপাক ও অপবিত্র।"[১]

তিনি জাহিলী যুগের অন্ধ গোত্রপ্রীতিকে নাজায়েয বলে অভিহিত করেন এবং 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করবে চাই সে জালিম হোক অথবা মজলুম।' –এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার জাহিলী নীতির পরিবর্তন ঘটান যার ওপর তাদের সমগ্র জীবন পরিচালিত হচ্ছিল।

নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে তার লোকদের বাতিল ও মিথ্যার ওপর সাহায্য করল সে সেই উটের ন্যায় যে উট কুয়োয় নিক্ষিপ্ত হতে চলেছে আর লোকে তার লেজ ধরে ঠেকাচ্ছে।[২] আরবদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, এখন আর তাদের রুচি ওপরে উল্লিখিত বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যটি হজম করতে পারছিল না। এরপর একবার যখন নবী করীম (সা) বললেন, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য করবে চাই সে জালিম হোক অথবা মজলুম" তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মজলুমকে তো অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, কিন্তু জালিমকে সাহায্য করা হবে কী ভাবে?" তিনি বললেন, "তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, নিবৃত্ত করবে, এটাই তাকে সাহায্য করা।"[৩]

ইসলামী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ পরস্পরে সম্প্রীতিশীল, সহায়ক ও শক্তিবর্ধক হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। পুরুষেরা নারীর যিম্মাদার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। আর নারীরা সৎ, বিশ্বস্ত ও আমানতদার। তাদের অধিকার রক্ষার যিম্মাদার পুরুষ এবং পুরুষের অধিকার রক্ষায় তৎপর নারী।

দায়িত্বশীল সমাজ

গোটা সমাজের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মানব সমাজ এখন আর একটি অসহায়, এখতিয়ারহীন, অবশ অকেজো জামাত ছিল না যে জামাত না নিজ মস্তিষ্কের সাহায্যে কাজ আনজাম দিতে সক্ষম আর না পারে নিজস্ব এখতিয়ারে। তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও সাবালকত্ব এবং তার এখতিয়ার স্বীকার করে

১. সহীহ বুখারী; ২. তফসীর ইবনে কাছীর।
৩. বুখারী ও মুসলিম।

নেওয়া হয়েছিল। এই সমাজের প্রত্যেক সদস্য ছিলেন একজন দায়িত্বশীল ও এখতিয়ারের অধিকারী যিনি স্ব-স্ব গণ্ডি ও বৃত্তের মধ্যে দায়িত্বশীল ও এখতিয়ারের মালিক। মানুষ তার নিজ পরিবারের গার্জিয়ান ও দায়িত্বশীল অভিভাবক হতো। নারী তার স্বামীর ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং সে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে আদিষ্ট। কর্মচারী তার মনিব বা মালিকের সম্পদের যিম্মাদার এবং সে তার যিম্মাদারীর ব্যাপারে জওয়াবদিহি করতে বাধ্য ছিল। তদ্রূপই ইসলামী সমাজ একটি সচেতন ও ক্ষমতার অধিকারী সমাজ ছিল যার প্রত্যেক সদস্য তার নিজ কাজের জন্য জওয়াবদিহি করতে বাধ্য ছিল।

সমস্ত মুসলমান সত্যের সাহায্যকারীতে পরিণত হয়েছিল। তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। খলীফা যতক্ষণ আল্লাহ্র অনুগত থাকতেন ততক্ষণ মুসলমানরা তাঁর অনুগত থাকত। যদি খলীফা আল্লাহ্র নাফরমানী করতেন তাহলে আর এ আনুগত্য অবশিষ্ট থাকত না। নবী করীম (সা)-এর বাণীঃ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق-

অর্থাৎ 'স্রষ্টার অবাধ্যতার বিনিময়ে সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়' হুকুমতের প্রতীক চিহ্নে পরিণত হলো। যে ধন-সম্পদ ও বায়তুল মালের (তথা সরকারী কোষাগারের) অর্থকড়ি সুলতান, তার অমাত্য ও সভাসদবর্গের সহজ গ্রাস ও আমীর-উমারার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হতো এখন তা আল্লাহর আমানত মনে করা হচ্ছিল। এসব তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ও সঠিক স্থানে ব্যয় করা হচ্ছিল এবং মুসলমানরা ছিল এসব সম্পদের আমানতদার ও মুতাওয়াল্লী। খলীফার উদাহরণ ছিল য়াতীমের অভিভাবকের ন্যায়। তিনি (খলীফা) আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী হলে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং বিরত থাকতেন। আর অভাবী হলে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে যতটুকু না হলেই নয় সে পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্র সেই সুবিস্তৃত যমীন যাকে রাজা-বাদশাহ, সুলতান ও আমীর-উমারা নিজেদের উপভোগের সামগ্রী ও পৈতৃক সম্পদ ভেবে রেখেছিল, যাকে চাইত দরাজ হস্তে বিলিয়ে দিত এবং যাকে না চাইত হাত গুটিয়ে নিত, কেউ কেউ আবার এক্ষেত্রে কাপড়ের ন্যায় সংযোজন বিয়োজন করে জোড়াতালি দিত এখন আর তা ছিল না। এখন এগুলো ছিল আল্লাহ্র যমীন যার এক বিঘত পরিমাণেরও হিসাব দিতে হতো।

বিবেকবান সমাজ

মানব সমাজ দীর্ঘকাল থেকে নিজেদের এখতিয়ার ও অভিপ্রায় এবং স্বাদ ও রুচি খুইয়ে বসেছিল। তারা এক অভাবী প্রায় সমাজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল এক নিরুপায় ও অসহায় জামাত যাদের হাত-পা ছিল বাঁধা। যুদ্ধের সময় হোক, চাই শান্তি ও সন্ধির সময় হোক, তাদের মতামত কী তা কেউ জিজ্ঞেস করত না। সেই সমাজের সদস্যদেরকে আত্মোৎসর্গের, দুঃখ-কষ্ট সহ্যের ও কঠোর পরিশ্রমের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হতো, অথচ এজন্য তাদের কোন সায়ও থাকত না বা এর দ্বারা তাদের কোন উপকারও হতো না। তারা তাদের কর্মকর্তাদের পছন্দ করত না আর কর্মকর্তারাও তাদেরকে পছন্দ করত না। এরপরও তারা তাদের কথামত চলতে বাধ্য ছিল যাদের তারা অপছন্দ করত এবং তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে বাধ্য হতো যাদের তারা ঘৃণা করত। ফল হলো এই যে, তাদের দিলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যায়, আবেগ-উদ্দীপনা থিতিয়ে যায় এবং লোকের লোক দেখানো ও প্রতারণা-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অবজ্ঞা, ঘৃণা ও লাঞ্ছনা বরদাশ্‌তে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়।

প্রেম ও ভালবাসার সঠিক স্থান

প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত সেই উপাদান যার মস্তকে মানব ইতিহাসের অধিকাংশ বিস্ময়কর অর্জন ও আশ্চর্যজনক কৃতিত্বের স্বর্ণমুকুট স্থাপন করেছে যাকে মানুষ প্রেম ও ভালবাসা নামে স্মরণ করে থাকে, বহুকাল থেকে চরম উপেক্ষিত ও নিষ্প্রাণ অবস্থায় পড়ে ছিল। বহু শতাব্দী অবধি এমন কেউ ছিল না, যে একে কাজে লাগাতে পারে, এমন কেউ জন্মেনি, যে এর থেকে প্রকৃত ফায়দা হাসিল করতে পারে। ব্যস! সে কেবল চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের নশ্বর প্রদর্শনীর বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছিল। বহু কাল থেকে পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষের জন্ম হয় নি যিনি তাঁর সৌন্দর্য ও কামালিয়াত তথা নিজের মহোত্তম গুণাবলী দ্বারা সমগ্র মানব জাতির ভালবাসার হকদার হবেন এবং আপন শক্তি ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দ্বারা এই ভালবাসা থেকে কাজ নিতে পারেন। আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সত্তার মধ্যে মানবতা তার সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদটি পেয়ে যায়। তিনি ছিলেন সেই মানুষ যাঁকে আল্লাহ তা'আলা সামগ্রিক গুণাবলী দান করেছিলেন। সব বৈধ সৌন্দর্য-সৌকর্যের সমাহার বানিয়ে ছিলেন। যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের ভাষ্য হলো ঃ তাঁকে যারা হঠাৎ করে দেখত– কী এক অজানা ভয়ে তাদের বুক দুরু দুরু করে কাঁপত। আবার যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

মেলামেশার সুযোগ পেতেন, তাঁরা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রশংসাকারীরা বলতেনঃ তাঁর মতো তাঁর আগে না আর কাউকে দেখেছি, আর না তাঁর পরেই আর কাউকে দেখেছি। তাঁর আগমনের পর সত্যিকার ও পাক-পবিত্র ভালবাসা বাঁধভাঙা প্লাবনের ন্যায় দু'কূল উপচে পড়ে। মানুষের হৃদয়-মন এভাবে আকর্ষণ করে যেভাবে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও হৃদয় আগে থেকেই তাঁর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর উম্মতের সদস্যেরা তাঁর প্রতি এমন অনুরাগ ও আনুগত্য প্রদর্শন করে যার নজীর প্রেম ও ভালবাসার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর আনুগত্য ও তাবেদারীর মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করার এবং নিজের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ লুটিয়ে দেবার এমন সব ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি আর না ভবিষ্যতে দেখতে পাবার আশা করা যায়।

অনুরাগ ও আত্মোৎসর্গ

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় একবার তাঁর ওপর শত্রুরা আক্রমণ করে বসে। ওৎবা ইবনে রবী'আ তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিল। ফলে তাঁর চেহারা এমনি ফুলে গিয়েছিল যে, তাঁকে দেখে চেনাই মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। বনু তামীম তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়। তিনি যে তাতে নির্ঘাত মারা যাবেন এতে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বেলা ডোবার পর তিনি জ্ঞান ফিরে পান। তারপর প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর খবর কি? তিনি কেমন আছেন? লোকে তাঁর একথা শুনতেই ক্রোধান্বিত হয়, এই অবস্থাতেও তিনি তাঁরই কথা স্মরণ করছেন, যাঁর কারণে আজ তাঁর এই করুণ হাল! এজন্যে তারা তাঁকে ভর্ৎসনা ও কটুকাটব্য করতে লাগল। তারা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মা উম্মুল-খায়রকে ডেকে বলল, দেখুন! তাঁর কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করুন। মা তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে সেই একই কথা, বল, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথী সম্পর্কে কিছুই জানি না। তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, আপনি খাত্তাব-কন্যা উম্মু জামীলের কাছে যান এবং তাঁর কুশল জেনে এসে আমাকে জানান। তিনি উম্মু জামীলের কাছে গিয়ে বলেন, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর কুশল জানতে চাচ্ছে। উম্মু জামীল বললেন, আমি আবূ বকরকেও চিনি না আর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহকেও জানি না। আপনি যদি চান তাহলে

আমি বরং আপনার সাথে গিয়ে আপনার ছেলেকে এক নজর দেখে আসতে পারি। তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন, ঠিক আছে, চলুন। এরপর উভয়ে একত্রে আবূ বকর (রা)-এর ঘরে এসে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলেন। উম্মু জামীল আবূ বকর (রা)-এর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! যে সম্প্রদায় আপনার সাথে এরূপ (নিষ্ঠুর ও নির্দয়) আচরণ করেছে তারা দুরাচার ও কাফির। আমি আশা করি আল্লাহ্ তাদের থেকে আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেনঃ আগে বলুন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা কেমন? তিনি কেমন আছেন? উম্মু জামীল বললেন, আপনার মা তো শুনতে পাচ্ছেন! তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। উম্মু জামীল তখন বললেন, তিনি ভাল আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি এখন কোথায়? বললেন, তিনি এখন আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আর আমি পানাহার করতে পারি না যতক্ষণ না আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হই। এরপর তাঁরা উভয়ে কিছুটা অপেক্ষা করলেন। রাত হলো এবং মানুষের চলাফেরা ও আনাগোনা যখন থেমে গেল তখন উম্মু জামীল আবূ বকর (রা)কে নিয়ে আরকামের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি হুযূর আকরাম (সা)-কে দেখামাত্রই যেন জীবন ফিরে পেলেন। এরপর তিনি পানাহার করেন।[১]

জনৈক আনসারী মহিলা, যাঁর বাপ-ভাই ও স্বামী ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদত লাভ করেছিলেন, নিজ আবাস থেকে বেরিয়ে লোকদের জিজ্ঞেস করতে থাকেনঃ রসূলুল্লাহ (সা)-এর খবর কি? তিনি কেমন আছেন? লোকেরা জওয়াবে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! তিনি ভাল আছেন, সুস্থ আছেন যেমনটি তুমি চাও। মহিলাটি বলল, আমাকে দেখাও। আমি হুযূর (সা)-কে দেখতে চাই। এরপর মহিলা হুযূর আকরাম (সা)-কে দেখামাত্রই আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর আর সব বিপদ-আপদই তুচ্ছ।[২]

হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলে চড়ানো হয়। শূলে চড়াবার পূর্বে তাঁর ঈমানী দৃঢ়তার পরীক্ষা নেবার উদ্দেশে কাফিররা বলেছিল, আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাছীর কৃত, ২য় খণ্ড. ৩০ পৃ.।
২. ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী।

পারি যদি তুমি এতে রাজী থাক, আমরা তোমাকে মুক্তি দেই আর তোমার স্থলে মুহাম্মদ (সা)-কে ফাঁসি দিই। একথা শুনতেই তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তো এও পছন্দ করি না, তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিঁধুক আর আমি তার বিনিময়ে মুক্তি পাই। খুবায়ব (রা)-এর কথায় তারা সকলেই হেসে ফেলে।[১]

হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহ্র রসূল (সা) আমাকে সা'দ ইবনুর রবী'র সন্ধানে পাঠালেন এবং আমাকে বললেন, যদি তুমি তাকে পাও তবে আমার সালাম বলবে এবং বলবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) জানতে চেয়েছেন তুমি এখন কেমন বোধ করছ। যায়দ (রা) বলেন, আমি নিহতদের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। এর পর তাঁকে পেতেই গিয়ে দেখলাম, তাঁর অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। তাঁর শরীরে তীর, তলোয়ার ও বল্লমের সত্তরটির মত আঘাত। আমি তাঁকে বললামঃ সা'দ! আল্লাহর রসূল (সা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন, আপনার অবস্থা এখন কেমন? আপনি কেমন বোধ করছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার সালাম বলবে এবং আরও বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আর আমার সম্প্রদায় আনসারদের বলবে, যদি তোমাদের অনবধানতায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যদি তোমাদের একটি চোখও অক্ষত থাকে তাহলে আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন ওযর থাকবে না। এর পরক্ষণেই তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়।[২]

ওহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবী হযরত আবূ দুজানা (রা) কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তীর-তলোয়ারের হাত থেকে রসূল (সা)-কে বাঁচাতে আপন পৃষ্ঠদেশকে ঢালের ন্যায় পেতে দিয়েছিলেন। নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তাঁর পিঠে এসে লাগত আর তিনি এক চুলও নড়াচড়া করতেন না।[৩] মালিক আল-খুদরী (রা) রসূল আকরাম (সা)-এর ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত চুষে খেয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। যায়দ (রা) তাঁকে থুথু ফেলতে বলেন। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনোই থুথু ফেলব না।[৪]

আবূ সুফিয়ান যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর নিজ কন্যা উম্মুল-মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-এর ঘরে গিয়ে ওঠেন এবং রসূল

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪ খ. ৬৩ পৃ.।
২. যাদু'ল-মা'আদ, ২খ. ১৩৪।
৩. প্রাগুক্ত, ১৩০ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃ.।

আকরাম (সা)-এর বিছানায় বসতে উদ্যত হন। উম্মু হাবীবা (রা) তৎক্ষণাৎ বিছানা উল্টিয়ে দেন। বিস্মিত আবূ সুফিয়ান কন্যাকে বলেন, বেটি! আমি জানি না, তুমি কি আমাকে এই বিছানার উপযুক্ত মনে করনি৷নাকি এই বিছানাই আমার উপযোগী নয় মনে করেছ। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন , না, তা নয়, বরং এ বিছানা স্বয়ং আল্লাহ্র রসূলের আর আপনি মুশরিক বিধায় অপবিত্র (অতএব আপনি এ বিছানায় বসার উপযুক্ত নন)।[১]

ওরওয়া ইবন মাসঊদ ছাকাফী হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আপন সঙ্গী-সাথীদের বলেছিলেন, লোক সকল! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছি। পারস্য সম্রাট কিসরা, রোম সম্রাট কায়সার ও আবিসিনিয়া অধিপতি সম্রাট নাজাশীর দরবারেও গিয়েছি, দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদের সাথীরা মুহাম্মদকে যতটা সম্মান ও সমীহ করে, ততটা সম্মান ও সমীহ কোন রাজা-বাদশাহর সাথীদেরকে তাদের রাজা-বাদশাহদেরকে করতে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, যখন তিনি থুথু ফেলেন তখন তা তাদেরই কারোর হাতের ওপর গিয়ে পড়ে। আর অমনি তাঁরা তা তাঁদের মুখমণ্ডল ও শরীরে মেখে নেয়। যখন তিনি কোন কাজের নির্দেশ দেন অমনি সেই নির্দেশ পালনে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তিনি যখন ওযূ করেন তখন সেই গড়িয়ে পড়া পানি সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। তিনি যখন কথা বলেন, তখন তারা নিজেদের স্বর নিচু করে দেয় এবং অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশত তারা কখনই তাঁর চেহারার দিকে গভীর ও পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় না।[২]

আনুগত্য ও তাঁবেদারী

আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রেম ও ভালবাসার অনিবার্য ও অপরিহার্য ফসল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন প্রেম ও ভালবাসার সম্পদে ধন্য হলেন তখন তাঁরা তাঁদের সকল শক্তি তাঁর আনুগত্যের পেছনে ব্যয় করলেন। আর এর সর্বোত্তম উদাহরণ হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর সেই বিখ্যাত উক্তি যা তিনি আনসারদের পক্ষ থেকে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে করেছিলেন ঃ

"আমি আনসারদের পক্ষ থেকে খোলা মন নিয়ে বলছি এবং তাদের পক্ষ থেকে জওয়াবও দিচ্ছি। আপনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করুন, যার সঙ্গে চান সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যার সঙ্গে খুশি সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আমাদের ধন-সম্পদ

১. সীরাত ইবনে হিসাম। ২. যাদুল মা'আদ, ২খ. ১২৫ পৃ.।

যা ইচ্ছা ও যতটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা খুশি বিলিয়ে দিন। আপনি আমাদের থেকে যা গ্রহণ করবেন তা অনেক বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে তা থেকে যা আপনি রেখে যাবেন। যে ব্যাপারে যা কিছু আপনি হুকুম করবেন আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নেব এবং তার প্রতি অনুগত থাকব। আল্লাহ্র কসম! আপনি যদি বার্ক-এ গামাদান পর্যন্ত চলে যান আমরাও আপনার অনুগমন করব এবং আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আপনি যদি ঘোড়াসহ সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে কালবিলম্ব না করে আপনার পেছনে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"[১]

তাঁদের আনুগত্যের আরেকটি উদাহরণ নিন! রসূলুল্লাহ (সা) যখন সেই তিনজন সাহাবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন যাঁরা তবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তখনও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সেই নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। মদীনা উল্লিখিত তিনজনের জন্য একটি নির্জন পুরীতে পরিণত হয় যেখানে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য একটি জনপ্রাণীও ছিল না, ছিল না তাঁদের কথার জওয়াব দেবার মত একজন মানুষও। (তাঁদের একজন) কা'ব (রা) বলেন ঃ

"রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের তিনজনের (যথাক্রমে হযরত কা'ব, হেলাল ইবন উমাইয়া ও মারারা ইব্ন রবী'আ) সঙ্গে কথা বলতে সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। লোকেরা আমাদেরকে এরপর থেকে এড়িয়ে চলতে লাগল এবং আমাদের সম্পর্কে তাদের নজরই যেন বদলে গেল, এমন কি গোটা দুনিয়াটাই বিশাল ও বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। যে জগৎটাকে আমি জানতাম ও চিনতাম এ যেন সেই জগত নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগত। এমন কি আমাদের সম্পর্কে লোকের উপেক্ষা যখন আরও বৃদ্ধি পেল তখন একদিন আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম এবং আবূ কাতাদার প্রাচীর টপকে তার বাগানে ঢুকে পড়লাম। এই আবূ কাতাদা আর কেউ নয়, আমারই চাচাতো ভাই, ছিল সর্বাধিক প্রিয়জন। আমি তাঁকে দেখা মাত্রই সালাম করলাম, অথচ কী আশ্চর্য! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে আমার সালামের উত্তরটা পর্যন্ত দিল না। আমি তাকে বললাম যে, আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি তো জান, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-কে ভালবাসি। সে চুপ করে থাকল। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম এবং তাকে আল্লাহ্র দোহাই দিলাম, কিন্তু তারপরও সে চুপ রইল। আমার কথার উত্তর দিল না।

১. যা'দুল মা আদ, পৃ. ১৩০।

আমি আবারও সেই একই কথা বললাম এবং তাকে আল্লাহ্র দোহাই দিলাম। তখন সে কেবল এতটুকু বলল, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং দেওয়াল টপকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।"[১]

তাঁর আনুগত্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত এও যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অসন্তোষ ও উপেক্ষার শিকার ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে আল্লাহ্র রসূলের দূত এল এবং বলল, রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বললেন, আমি কি আমার স্ত্রীকে তালাক দেবঃ দূত বলল, "না, বরং আলাদা থাকবেন, কাছে যাবেন না।" এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলে দিলেন সে যেন তার পিতৃগৃহে চলে যায় এবং সেখানেই থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা করেন।[২]

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁর প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্কের অবস্থা ছিল এই যে, সকলের ওপর তিনি তাঁকে (আল্লাহ্র রসূলকে) অগ্রাধিকার দিতেন। ঠিক বয়কট চলাকালেই গাসসান অধিপতি তাঁদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ করে এবং তাঁকে তার দরবারে আগমনের আহ্বান জানায়। উপেক্ষা ও ভর্ৎসনার এই সময়টা আসলেই খুব কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত ছিল। কিন্তু তদ্সত্ত্বেও তিনি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমি মদীনার বাজারে ঘোরাফেরা করছিলাম। এমন সময় জনৈক সিরীয় নাবাতীয় যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উদ্দেশে মাঝে-মধ্যে মদীনায় আগমন করত, উপস্থিত লোকদের কাছে আমার সন্ধান জানতে চায়। লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দিলে সে কাছে এসে গাসসান অধিপতির একটি পত্র আমার হাতে তুলে দেয়। আমি লেখাপড়া জানতাম। পত্র পড়লাম। পত্র ছিল নিম্নরূপ :

"আমরা জানতে পেরেছি তোমাদের মনিব তোমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য রাখেন নি এবং তোমাকে নষ্ট করতে চান না। ব্যস! তুমি আমাদের কাছে চলে এস । আমরা তোমার প্রতি খেয়াল রাখব এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা দেব।"

১. বুখারী ও মুসলিম। ২. বুখারী ও মুসলিম।

চিঠি পড়া মাত্রই আমি বুঝতে পারলাম এও এক পরীক্ষা। এরপর আমি পত্রটা নিকটস্থ একটি জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলাম।[১]

আনুগত্য ও নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে তা পালনের আরেকটি উদাহরণ নিন যা মদ পান হারাম ঘোষিত হবার সময় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হযরত আবূ বুরদা তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমরা মজলিসে বসে মদ পান করছিলাম। তারপর আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়া ও তাঁকে সালাম দেয়ার নিমিত্ত উঠে পড়লাম। এদিকে ইতিমধ্যেই মদ পান হারাম হবার ঘোষণা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়ে গিয়েছিল।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ - المائدة

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" (সূরা মায়িদা, ৯০-৯১ আয়াত)

আমি আমার সাথীদের কাছে এলাম এবং আমি এই আয়াত هَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ- পর্যন্ত পড়ে তাদেরকে শুনিয়ে দিলাম। তিনি বলেন যে, সঙ্গী-সাথীদের ভেতর কারো কারো হাতে মদপূর্ণ পেয়ালা ছিল। কিছুটা পান করেছে আর পেয়ালায়ও কিছুটা অবশিষ্ট আছে, এমন কি ঠোঁট মদ স্পর্শ করেছে, এমতাবস্থায়ও তারা তক্ষুণি তা থুক করে ফেলে দিয়েছেন (আর পেয়ালাগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন)।"[২]

১. বুখারী ও মুসলিম।
২. তফসীর ইবনে জরীর, ৭ম খণ্ড।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য ও নিজের ওপর, পরিবারের সদস্যদের ওপর এবং বংশের লোকজনের ওপর তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদানের একটি অনন্য ও অভূতপূর্ব উদাহরণ হলো এই যে, (কুখ্যাত মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলের পুত্র আবদুল্লাহকে একবার রসূলুল্লাহ (সা) ডেকে পাঠান এবং বলেন : শুনেছ, তোমার পিতা কী বলছে? আবদুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। তিনি কি বলছেন? আল্লাহর রসূল (সা) বললেন : বলছে, যদি মদীনায় ফিরি তো যারা সম্মানিত তারা লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে। আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। আল্লাহর কসম! আপনি সম্মানিত এবং তিনি লাঞ্ছিত ও অবমানিত। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মদীনায় তশরীফ নিন। ইয়াছরিববাসী জানে, সেখানে আমার চেয়ে আমার পিতার সর্বাধিক অনুগত ও বাধ্য আর কেউ নেই। যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল চান, আমি তার মাথাটা (কেটে) নিয়ে আসি তাহলে তার জন্যও আমি প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ (সা) এতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, না, আমি তা চাই না।

এরপর লোকে মদীনায় পৌঁছুলে আবদুল্লাহ মদীনার প্রবেশমুখে তলোয়ার হাতে তাঁর পিতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিতা সে পথে মদীনায় প্রবেশ করতে গিয়ে পুত্র আবদুল্লাহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। তিনি পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

আপনি বলেছেন যে, মদীনায় গিয়ে যিনি সম্মানিত তিনি লাঞ্ছিতকে বের করে দেবেন? আপনি এখনই জানতে পারবেন, সম্মানিত কে। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনি মদীনায় থাকতে পারবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখন চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল ঃ

ওহে, খাযরাজ বংশীয় লোকেরা! তোমরা দেখ, আমার ছেলে আমাকে আমার ঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। ওহে খাযরাজের লোকেরা! আমার ছেলে আমার ঘরে যেতে আমাকে বাধা দিচ্ছে। আমাকে আমার বাড়ি যেতে দিচ্ছে না।

লোকজন একত্র হতেই তিনি বলে উঠলেন ঃ

আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রসূলের অনুমতি ছাড়া তিনি মদীনার ভেতর এক পাও ফেলতে পারবেন না।

লোকে তাঁকে বোঝাতে লাগল । কিন্তু তিনি তাঁর কথায় অনড় ও অটল। তিনি বলেই চললেন ঃ না, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুমতি ছাড়া তিনি এক পাও অগ্রসর হতে পারবেন না।

অবশেষে সকলেই নবী করীম (সা)-এর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে ব্যাপারটা বললেন। তিনি তখন বলে পাঠালেন, যাও! আব্দুল্লাহকে গিয়ে বল, সে যেন তার পিতাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেয়।

লোকে ফিরে এসে বলতেই তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এখন নবী করীম (সা)-এর অনুমতি পাওয়ার পর তিনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারেন।[১]

নতুন মানুষ নতুন উম্মাহ

এই বিস্তৃত ও গভীর ঈমান, এই শক্ত সুদৃঢ় পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা, এই সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞ দার্শনিকসুলভ প্রশিক্ষণ, অনন্য ও অত্যাশ্চর্য শক্তি ও ব্যক্তিত্ব এবং এই বিস্ময় উদ্রেককারী আসমানী কিতাবের সাথে যার অনন্য ও বিরল বস্তুসমূহ নিঃশেষ হবার নয় এবং যার সজীবতায় কখনো ঘাটতি পড়ে না। রসূলুল্লাহ (সা) মৃতপ্রায় মানবতার মাঝে এক নতুন জীবনের জন্ম দেন। মানবতার সেই সম্পদভাণ্ডার যা কাঁচামাল আকারে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছিল, যে সবের উপকারিতা, কল্যাণ ও ব্যয় খাত কারোরই জানা ছিল না, যেগুলোকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুফর ও কম হিম্মতি বরবাদ করে রেখেছিল, তিনি তাদের জীবনের গতিই পাল্টে দিলেন। আল্লাহ্‌র অপার সাহায্যে তিনি তার মধ্যে ঈমান ও আকীদা সৃষ্টি করে দিলেন। জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। চাপাপড়া যোগ্যতা তুলে ধরলেন এবং অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যকে উদ্ভাসিত করলেন। এরপর এসবের প্রতিটিকে সঠিক মর্যাদায় স্থাপন করলেন যেন এর জন্যই তার জন্ম হয়েছিল। যেন জায়গা শূন্য ছিল এবং যেন এরই সে অপেক্ষা করছিল। সে ছিল এক নিষ্প্রাণ পাথর। এখন সে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও জাগ্রত মানুষে পরিণত হলো। সে ছিল অনুভূতিশূন্য, নিশ্চল ও মৃত। এখন সে প্রাণ ফিরে পেয়ে বিশ্বের ওপর রাজদণ্ড পরিচালনা করছে। প্রথমে ছিল অন্ধ যে নিজেই রাস্তা চিনত না আর এখন সে সারা দুনিয়ার রাহবার ও পথ-প্রদর্শক হিসেবে মানুষকে পথ দেখাচ্ছে।

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেই স্থান থেকে বের হবার নয় ?" (সূরা আন'আম, ১২২ আয়াত)

১. তফসীরে তাবারী, ২৮তম খণ্ড.।

নবী করীম (সা)-এর মনোযোগ ও শিক্ষার বদৌলতে আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন বিপ্লব দেখা দিল যে, গোটা দুনিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাদের ভেতর সেই সব আজীমুশশান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে দেখল যাঁরা ছিলেন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সেই ওমর (রা) যিনি এক সময় তাঁর পিতা খাত্তাবের বকরী চরাতেন আর তাঁর পিতা তাঁকে নানা কারণে বকাঝকা করতেন, শক্তি ও সংকল্পে তিনি কুরায়শদের মধ্যম সারির লোকদের অন্তর্গত ছিলেন, অস্বাভাবিক কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তিনি ছিলেন না এবং তাঁর সমসাময়িক লোকজন তাঁকে অস্বাভাবিক কোন গুরুত্বও দিত না, সেই ওমর (রা) এক নিমিষে তৎকালীন বিশ্বকে নিজের মাহাত্ম্য ও যোগ্যতা দ্বারা বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলেন এবং রোম সম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন ছিনিয়ে নেন এবং এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করেন যা একই সঙ্গে উল্লিখিত দুই হুকুমতের ওপর পরিবেষ্টনকারী এবং প্রশাসনিক ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাখে। আর তাকওয়া, পরহেযগারী ও ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে যিনি ছিলেন তুলনাহীন—প্রবাদবাক্যের মত।

এই যে ওলীদের পুত্র খালিদের কথাই ধরুন। তিনি ছিলেন উৎসাহদীপ্ত কুরায়শ যুবকদের অন্যতম। স্থানীয় যুদ্ধগুলোতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কুরায়শ সর্দাররা গোত্রীয় যুদ্ধগুলোতে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করত। আরব উপদ্বীপ এলাকাগুলোতেও বড় কোন খ্যাতি অর্জন করেন নি। অকস্মাৎ খোদায়ী তলোয়ার হিসেবে তিনি ঝলসে ওঠেন (سيف من سيوف الله)। যা কিছুই সামনে আসে তিনি কেটেকুটে পরিষ্কার করে চলেন। আল্লাহ্‌র এই অবিনাশী তলোয়ার বিজলিবৎ রোম সাম্রাজ্যের মাথায় গিয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের বুকে অক্ষয় কীর্তি রেখে যায়।

ইনি আবূ উবায়দা যাঁর আমানতদারী ও নম্রতার প্রশংসা করা হতো। মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের পরিচালনা করতেন তিনি। তাঁকে দেখুন! মুসলমানদের সবচে' বড় নেতৃত্বের বোঝা বইছেন এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে সিরিয়ার উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূখণ্ড থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত করছেন। বেচারা সম্রাট দেশটার ওপর বিদায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন এবং বলছেন: হে সিরিয়া! তোমাকে বিদায়ী সালাম, এমন সালাম যার পর তোমার সাথে আর কখনো দেখা হবে না।

ইনি আমর ইবনু'ল-'আস যাকে কুরায়শদের বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে গণ্য করা হতো। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁকে আবিসিনিয়ায় পাঠায় যাতে মুসলিম মুহাজিরদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হন তিনি। তাঁকে দেখুন, মিসর জয় করছেন এবং বিরাট শক্তির অধিকারী হচ্ছেন।

এই যে, ইনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস! ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর সম্পর্কে বড় কোন সামরিক অভিযানের নেতৃত্বের কথা জানা যায় না কিংবা যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ এ রকম কোন খ্যাতির পরিচয়ও পাওয়া যায় না। তাঁকে দেখুন, মাদায়েনের চাবিগুচ্ছ সামলাচ্ছেন এবং ইরাক ও ইরানকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে চিরদিনের জন্য 'ফাতিহ-এ আজম' তথা শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলে অভিহিত হচ্ছেন।

ইনি সালমান ফারসী, একজন ধর্মযাজকের পুত্র। পারস্যের এক অজ পাড়া-গাঁয়ে তাঁর জন্ম। এক গোলামি থেকে আরেক গোলামি, এক বিপদ থেকে আরেক বিপদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হতে হতে মদীনায় এসে উপনীত হচ্ছেন এবং ইসলাম কবুল করছেন। তাঁকে দেখুন! তাঁরই স্বজাতির বিশাল রাজধানীর (মাদায়েন) প্রশাসক হয়ে আসেন। গতকাল যিনি ছিলেন একজন নগণ্য প্রজামাত্র, আজ তিনি তার প্রশাসক। তার চাইতেও অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এতদসত্ত্বেও তাঁর নিজের ভোগবিমুখ জীবনধারায় কোনরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। লোকে দেখতে পাচ্ছে, তাদের প্রশাসক একটি সাধারণ ঝুপড়িতে অবস্থান করেন এবং নিজের মাথায় বোঝা বহন করেন।

ইনি কাফ্রী-গোলাম বেলাল। সম্মান ও মর্যাদার এমন উঁচু স্তরে গিয়ে উপনীত যে, স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনও তাঁকে 'আমাদের নেতা' 'আমাদের সর্দার' বলেন। ইনি আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম (সালেম) যাঁর মধ্যে হযরত ওমর (রা) খেলাফত লাভের যোগ্যতা ও সামর্থ্য দেখতে পান। তিনি বলেন: আজ যদি তিনি (সালেম) বেঁচে থাকতেন তবে আমি তাকেই খলীফা নিযুক্ত করে যেতাম।

ইনি যায়দ ইবন হারিছা, মূতার যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন অথচ সেই বাহিনীতেই জাফর ইবন আবূ তালিব, খালিদ ইব্ন ওলীদের মত বিশিষ্ট লোকেরা বর্তমান এবং তাঁর পুত্র উসামা এমন এক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন যে বাহিনীতে আবূ বকর (রা), ওমর (রা)-এর মত লোকেরা বর্তমান।

আর এই যে, এঁরা হলেন আবূ যর, মিকদাদ, আবুদ-দারদা, আম্মার ইবন ইয়াসির, মুআয ইবন জাবাল ও উবাই ইবন কা'ব (রা)। ইসলামের বসন্ত

সমীরণের একটা ঝটকা তাঁদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতেই দেখতে দেখতে তাঁরা দুনিয়ার খ্যাতনামা সাধক ও জ্ঞানী-গুণী বলে গণ্য হতে থাকেন। এঁরা হলেন আলী ইবন আবূ তালিব (রা), আয়েশা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা), যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)– যাঁরা নিরক্ষর নবী (সা)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়ে দুনিয়ার মহান ও শ্রেষ্ঠতম আলিমদের কাতারে পরিগণিত হচ্ছেন, যাঁদের থেকে জ্ঞানের নহর ও প্রজ্ঞার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী, অশুভ লৌকিকতা থেকে দূরে তাঁদের অবস্থান। যখন কথা বলেন, তখন মহাকাল নিঃশব্দে নীরবে তাঁদের কথা শুনতে থাকে। যখন সম্বোধন করেন তখন দুনিয়ার বড় বড় ঐতিহাসিকের কলম তা লিপিবদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে যাতে করে একটি শব্দও হারিয়ে না যায়।

ভারসাম্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠী

এরপর অল্প দিনও অতিক্রান্ত হয়নি, সভ্য দুনিয়া দেখতে পেল সেই সব কাঁচামাল যেগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল, সমকালীন জাতিগোষ্ঠীগুলো যেসবের এতটুকু কদর করেনি, প্রতিবেশী দেশগুলো যাদেরকে উপহাস করেছিল, সেগুলোর সমন্বয়ে এমন এক সমন্বিত বস্তু (মাজমূ'আ) তৈরি হলো যে, মানব ইতিহাস এর চেয়ে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত কামালিয়াত দেখেনি। এ যেন একটি ঢালাইকৃত গোলাকার বস্তু যা দেখে বোঝাই যেত না যে, এর মাথা কোন্ দিকে অথবা রহমতের বারিধারার ন্যায় যার সম্পর্কে জানা যেত না যে, এর প্রথম ফোঁটাই বেশি বরকতময়, নাকি শেষ ফোঁটা! এমন সমন্বিত ও সুসংবদ্ধ যা মানব জীবনের প্রতিটি শাখার যোগ্যতা রাখে। দীন-দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় আসবাব-উপাদান তাতে বিদ্যমান। এজন্য কারোর কাছে তার সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সমগ্র দুনিয়া তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

এই নবোদ্ভূত জামাত নিজেই তার সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। নতুন হুকুমতের ভিত্তিপ্রস্তরও সে নিজেই স্থাপন করে, অথচ এর আগে এর কোন অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। তা সত্ত্বেও সে এর আদৌ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি যে, অপর কোন জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে কোন লোক ধার নেবে কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অন্য কোন হুকুমতের কাছে সাহায্য চাইবে। এমন হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করে যার শাসন দু'দু'টো মহাদেশের সুবিশাল বিস্তৃত এলাকায় চলত। এর প্রতিটি শাখায় ও প্রতিটি প্রয়োজনের নিমিত্ত বেশ কিছু লোক এমন ছিলেন যাঁরা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্মকুশলতা, সততা,

বিশ্বস্ততা, শক্তি-সামর্থ্য ও দায়িত্বানুভূতির ক্ষেত্রে ছিলেন তুলনাহীন। এই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য কায়েম হলে এই নবোদ্ভূত জাতিগোষ্ঠী, যার জন্ম খুব বেশি দিন আগে হয়নি, এর প্রয়োজনীয় সকল লোকজন সরবরাহ করে যাদের কেউ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও প্রশাসক, কেউ ছিলেন আমানতদার কোষাধ্যক্ষ, কেউ ছিলেন ন্যায়বিচারক কাযী, কেউ বা ইবাদতগুযার নেতা, কেউ পরহেযগার মুত্তাকী সমরনায়ক। এই মানসিক প্রশিক্ষণের বরকতে যে কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল এবং এই ইসলামী দাওয়াতের সাহায্যে যা স্থায়িভাবে চলছিল, এই ইসলামী হুকুমত যোগ্যতম, আল্লাহভীরু, দায়িত্বসচেতন ও কর্মক্ষম কর্মকর্তা-কর্মচারী পেতে থাকে। হুকুমতের যিম্মাদারী সেই সব লোকের কাঁধে অর্পিত হতো যারা হেদায়েতকে রাজস্ব আদায়ের মানসিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করতেন, যাঁরা নিজেদেরকে তহশীলদার-কালেক্টরের পরিবর্তে মুবাল্লিগ ও হাদী (ইসলামের প্রচারক ও পথপ্রদর্শক) মনে করতেন, যাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যোগ্যতা ও ন্যায়পরতা এবং দীন ও দুনিয়ার বিশুদ্ধ মিশ্রণ থাকত। এর প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসহকারে উদ্ভাসিত হয় এবং দীনের বরকতসমূহ এভাবে অস্তিত্ব লাভ করে যে, এরপর কোন যুগেই তা এভাবে দেখা যায়নি।

বস্তুত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবূওত ও রিসালাতের চাবি মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির তালার ওপর রেখে দিয়েছিলেন। ব্যস! চোখের পলকে তা খুলে গেল এবং এর সমস্ত রত্নভাণ্ডার, অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ, শক্তিরাজি ও কামালিয়াত দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল। তিনি জাহেলিয়াতের শাহরগ কেটে দেন এবং তার সকল জারিজুরি ভেঙেচুরে চুরমার করে দেন। তিনি বিদ্রোহী, অবাধ্য ও একগুঁয়ে পৃথিবীকে আল্লাহ্‌র শক্তির সাহায্যে বাধ্য করলেন যিন্দেগীর এক নতুন রাজপথের যাত্রী হতে এবং ইতিহাসে মানবতার একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করতে। এটাই ছিল সেই ইসলামী যুগ যা ইতিহাসের ললাটে সর্বদাই উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলজ্বল করে চমকাতে থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের নেতৃত্বের যুগ

মুসলমানদের নেতাসুলভ বৈশিষ্ট্যাবলী

মুসলমানরা কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করল। দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর তারা নিজেদের হাতে তুলে নিল এবং নেতৃত্বের আসনে জেঁকে বসা অসুস্থ ও পীড়িত জাতিগোষ্ঠীকে অপসারণ করল যেই নেতৃত্ব তারা কখনোই সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। মুসলমানরা পৃথিবীর মানুষদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক গতিতে সহীহ মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। তাদের মধ্যে সেই সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল যা ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বের মহান পদমর্যাদার যোগ্য পাত্র বলে প্রমাণ করত এবং তাদের তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করত। তাদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এরূপ:

১. তাঁদের কাছে ছিল আসমানী কিতাব ও খোদায়ী শরীয়ত। এজন্য তাঁদের অনুমাননির্ভর হবার কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়নের যেমন দরকার ছিল না, তেমনি তাঁরা মূর্খতা ও অজ্ঞতা, প্রতিদিনের আইনগত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংস্কার এবং মারাত্মক রকমের ভ্রান্তি ও অনাচার থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিল। নিজেদের রাজনীতি ও পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে দিক্‌ভ্রান্তভাবে চলা ও অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও তাঁরা বাধ্য ছিল না। তাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহী ছিল, ছিল খোদায়ী শরীয়তের প্রদীপ্ত রৌশ্‌নী যার ওপর নির্ভর করে তারা পথ চলত এবং যার সাহায্যে জীবনের সমস্ত রাস্তা ও তার বাঁকসমূহ তাঁদের জন্য আলোকিত ছিল। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই আলোতে গিয়ে পড়ত এবং মনযিলে মকসূদ তাঁদের পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হতো।

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে বের হবার নয় ?" (সূরা আন'আম ঃ ১২২)

তাঁদের কাছে খোদায়ী কানূন ছিল যে অনুসারে তাঁরা লোকের মধ্যে ফয়সালা করত। তাঁদেরকে হক ও ইনসাফের তথা সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর উস্কানি ও উত্তেজনা এবং শত্রুতা ও অপ্রসন্ন অবস্থায়ও ইনসাফ ও সততার আঁচল হাতছাড়া করতে ও প্রবৃত্তির চাহিদা মাফিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ.ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে। এটাই তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"(সূরা মায়িদাঃ ৮)

২. তাঁরা হুকুমত ও নেতৃত্বের পদে সুদৃঢ় নৈতিক ও চারিত্রিকি প্রশিক্ষণ এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পর সমাসীন হয়েছিলেন। তাঁরা দুনিয়ার সাধারণ শাসক জাতিগোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীন লোকদের ন্যায় নিজেদের সব রকমের নৈতিক ক্রটি-বিচ্যুতিসহ নিচ থেকে ওপরের দিকে লাফ দেয়নি, বরং দীর্ঘকাল যাবত আসমানী প্রত্যাদেশ (ওহী-এ-ইলাহী) তাঁদের সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান করেছিল এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাধীনে ছিল। তিনি তাঁদের তাযকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধি করতে থাকেন এবং তাঁদের পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দান করেন। যুহ্‌দ (পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা) ও পরহেযগারীর সংযমী জীবনে তাঁদেরকে অভ্যস্ত করেন। সচ্চরিত্রতা, শালীনতা, আমানতদারী, অন্যের মুকাবিলায় নিজের স্বার্থ ত্যাগ, কুরবানী, আল্লাহ্‌র ভয় ইত্যাদিতে অভ্যস্ত বানান। হুকুমত ও পদের প্রতি লোভ বা মোহ তাঁদের দিল্ থেকে বের করে দেন। স্বয়ং তাঁর ইরশাদ ছিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন পদ এমন কোন লোককে সমর্পণ করব না যে এর প্রার্থী কিংবা এর প্রতি আগ্রহী।"[১] ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও

১. বুখারী ও মুসলিম।

ফেতনা-ফাসাদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁদের দিল একেবারেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কানে রাত-দিন কুরআন মজীদের এই আয়াত গুঞ্জরিত হতোঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ-

"এটা আখেরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা কাসাস : ৮৩)

এজন্যই তাঁরা হুকুমতের পদসমূহের ওপর পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত না, বরং তাঁরা এসব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করত এবং এর যিম্মাদারী তাঁদেরকে শংকিত করে তুলত। তাঁদের প্রত্যেকেই পিছু হটত এবং নিজেকে এই বোঝা বহনের অনুপযুক্ত মনে করত। নিজে যেচে পদপ্রার্থী হবে, এজন্য নিজের নাম পেশ করবে, নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা গাইবে, নিজের সপক্ষে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় নামবে, সে তো আরও অকল্পনীয়। এরপরও যখন তাঁরা কোন যিম্মাদারী নিজের হাতে তুলে নিত তখন তাকে লুটের মাল ভাবত না এবং তা গ্রাস করার জন্য এগিয়ে যেত না, বরং একে নিজের যিম্মায় অর্পিত এক পবিত্র আমানত ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মনে করত এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্‌র সামনে তাকে একদিন হাযির হতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে ছোট-বড় সব কিছুর জওয়াব দিতে হবে। তাঁরা সব সময় চোখের সামনে রাখত:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে।" (সূরা নিসা : ৫৮) অধিকন্তু থাকত আল্লাহ্‌র এই বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

"তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশে তোমাদের কতককে কতকের ওপর

মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (সূরা আনআম : ১৬৫)

৩. তাঁরা কোন জাতিগোষ্ঠীর সেবাদাস কিংবা কোন রাজবংশের ও দেশের প্রতিনিধি ছিল না যাদের সামনে কেবল তাদের সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য, উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য, যারা কেবল সেই জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং অবশিষ্ট সমস্ত জাতিগোষ্ঠী শাসিত হবার জন্যই পয়দা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাঁরা আরব ভূখণ্ড থেকে এজন্য বের হয়নি, দুনিয়ার বুকে আরবশাহীর বুনিয়াদ স্থাপন করবে এবং তার ছায়ায় আরাম-আয়েশের জীবন কাটাবে আর এর সমর্থনে অন্যদের ওপর গর্ব ও অহংকার করবে। এজন্যও নয় যে, লোকদের রোমান ও পারসিকদের গোলামি থেকে বের করে আরবদের ও তাঁদের নিজেদের গোলামিতে নিয়োজিত করবে। তাঁরা কেবল এজন্য বেরিয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের মত সমস্ত মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে কেবল লা-শারীক আল্লাহ্‌র গোলামি ও বন্দেগীতে স্থাপন করবে। মুসলিম দূত হযরত রিবঈ ইব্‌ন আমের (রা) পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগির্দের ভরা দরবারে এই সত্যেরই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এজন্যই পাঠিয়েছেন যাতে আমরা মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র গোলামি ও বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণ কাল-কুঠরি থেকে মুক্তি দিয়ে তার প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির দিকে এবং নানা ধর্মের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে নাজাত দিয়ে ইসলামের আদল-ইনসাফে নিয়ে যাই।"[১]

অনন্তর দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী তামাম মানব সম্প্রদায় তাঁদের দৃষ্টিতে একই মর্যাদাভুক্ত ছিল। যদি পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা ছিল দীনদারীর পার্থক্য। রসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ইরশাদের ওপর তাদের পরিপূর্ণ আমল ছিলঃ

الناس كلهم من ادم وادم من تراب لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى الا بالتقوى -

"মানুষ মাত্রই আদমের বংশধর আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। কোন আরবের কোন অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি কোন অনারবের কোন আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই একমাত্র তাকওয়া ছাড়া।"[২]

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

১. ইবনে কাছীরকৃত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ৪০।

"হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল-আসের পুত্র একবার এক মিসরীয়কে বেত্রাঘাত করে এবং স্বীয় বাপ-দাদার নামে গর্ব করে। হযরত ওমর (রা) এই ঘটনা জানতে পেরে উক্ত মিসরীয়কে অভিযুক্ত থেকে বদলা নেবার নির্দেশ দেন এবং আমর ইবনুল-আসকে বলেন : তোমরা কবে থেকে লোকদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছ, অথচ তাদের মায়েরা স্বাধীন অবস্থায় তাদের জন্ম দিয়েছিল?[১]

ঐসব বিজেতা ও শাসক দীন-ধর্ম, ইল্‌ম তথা জ্ঞান ও সভ্যতা বিলাবার ক্ষেত্রে কখনো কার্পণ্য করেন নি কিংবা সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় দেন নি এবং রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে বা পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো তাঁরা দেশ-এলাকা-অঞ্চল ও বর্ণ-বংশের কথা বিবেচনা করেন নি। তাঁরা ছিলেন দয়ামায়ার মেঘমালার মত যা ছিল সমগ্র জগত জুড়ে বিস্তৃত। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা ও অনুগ্রহ-আনুকূল্য সর্বসাধারণের জন্য ছিল উন্মুক্ত যা গোটা জগতকেই প্লাবিত করেছে। যমীনের সকল অংশই তাঁদের জন্য দো'আ করেছে এবং সৃষ্টিজগত আপন আপন যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে এর থেকে উপকৃত হয়েছে।[২]

رهی اس سے محروم ابی نہ خا کی
ہری ہوگئ ساری کھیتی خدا کی

'এর থেকে জল ও স্থল কোনটাই বঞ্চিত থাকে নি,
'আল্লাহ্‌র যমীনের সকল ক্ষেত-খামারই সবুজ শ্যামল হয়ে গেছে।'

১.বিস্তারিত জানার জন্যে দ্র. ইবনুল জওযী কৃত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব।

২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেই হেদায়েত ও ইল্‌ম সহকারে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ভূমি খণ্ডে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। এর একটি অংশ নরম ও পরিষ্কার ছিল। সে পানি চুষে নিল। ফলে সেখানে বিরাট সবুজ ও তরতাজা ঘাস জন্মাল। কিছু অংশ ছিল কংকরময়, প্রস্তর সংকুল ও অনুর্বর। সে পানি ধরে রাখল এবং লোকে সেই সংরক্ষিত মজুদ পানি থেকে উপকৃত হল। নিজেরা সেই পানি পান করল এবং অপরকেও পান করাল। এক অংশ ছিল একেবারেই সমতল ময়দান। সে যেমন পানি ধরে রাখতে পারে না, তেমনি পানি শোষণও করতে পারে না যার ফলে সেখানে ঘাস-পাতা ও গাছপালা জন্মাবে। এ দৃষ্টান্ত তাদের যারা দীনের সমঝ লাভ করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যে বস্তুসহ পাঠিয়েছেন তার দ্বারা তারা লাভবান হয়েছে। তারা নিজেরাও শিখেছে, শিখিয়েছে এবং শেষ উদাহরণ তার যে মাথা তুলে দেখেও নি যে আমি কি এনেছি এবং আল্লাহর সেই হেদায়েত কবুল করে নি যা দিয়ে আমাদের পাঠানো হয়েছে (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম)।

ঐসব লোকের ছায়ায় ও শাসনাধীনে দুনিয়ার তামাম জাতিগোষ্ঠী, জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে ও সরকারী প্রশাসনে নিজ নিজ পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণে এবং আরবদের সঙ্গে পৃথিবীর পুনর্গঠনে শরীক হবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে বরং তাদের অনেক লোক বহু বিষয়ে আরবদেরও অতিক্রম করে যায়। তাদের মধ্যে এমন সব ফকীহ ও মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেন যারা স্বয়ং আরবদেরও মাথার তাজ ও মুসলমানদের গর্বের ধন। ইবনে খালদূনের ভাষায় ঃ এ এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক সত্য যে,মুসলিম মিল্লাতের ইল্‌ম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহকদের হাতে গোণা কয়েক জন ব্যতিরেকে অধিকাংশই অনারব। কী উলূমে শরঈয়ার ক্ষেত্রেই হোক, কী বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ আরবীয় রক্তের হয়েও থাকেন, তবুও ভাষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকগণ অনারব, যদিও তাঁদের ধর্ম আরবীয় এবং তাঁদের শরীয়ত নিয়ে যেই পয়গম্বর এসেছিলেন তিনিও আরবই ছিলেন।[১] পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও ঐসব অনারব মুসলমানদের মধ্যে এমন সব নেতৃস্থানীয় শাসক, মন্ত্রী, জ্ঞানী-গুণী, মনীষী ও বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা ছিলেন পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মানবতার নক্ষত্রসদৃশ এবং যাঁরা ব্যক্তিত্ব, আত্মার উৎকর্ষ, যোগ্যতা, প্রতিভা ও সামর্থ্যে, তদুপরি দীনদারী ও ইল্‌মের ময়দানে ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। এঁদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই তাঁদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না।

৪. মানুষ দেহ ও আত্মা, হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বিত রূপ। মানুষ প্রকৃত সৌভাগ্য ও কল্যাণ ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করতে পারে না এবং মানবতার ভারসাম্যময় উন্নতি ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের এই সমস্ত শক্তি পরীক্ষিতভাবে ক্রমোন্নত ও বিকশিত হবে। পৃথিবীতে সৎ ও সুস্থ সংস্কৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন এক ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে মানুষের জন্য খুব সহজে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে এবং অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনের দিক-নির্দেশনা ও সংস্কৃতির পরিচালনা ভার ঐ সমস্ত লোকের হাতে অর্পিত হবে যারা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের উভয়টির প্রবক্তা, ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিকতার পরিপূর্ণ নমুনা এবং, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মণ্ডিত। তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রশিক্ষণের মধ্যে যদি সামান্যতমও ফাঁক-ফোকর কিংবা দাগ থাকে তবে তা তাদের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং

১. মুকাদ্দিমা ইবনে খলদুন, মিসর সং ৪৯৯ পৃ.।

বিভিন্নরূপে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আর যদি এমন কোন দল বিজয়ী হয় যারা কেবলই বস্তুর পূজারী, বস্তুগত আনন্দ-উপভোগে বিশ্বাসী, যারা এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কোন জীবনে বিশ্বাস করে না এবং ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্যেও যাদের প্রত্যয় নেই, তবে তাদের মেযাজ-এর মূলনীতি ও প্রবণতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর পড়া অনিবার্য। উক্ত সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ ছাঁচে সে নিজেকে ঢেলে সাজাবেই এবং এর ওপর তার ছাপ সর্বদা স্থায়ী থাকবেই। ফল হবে এই যে, মানবতার একাংশে প্রাচুর্য উপচে পড়বে আর অন্যদিকে বিশাল এক অংশ রিক্ত হয়ে পড়বেই। সভ্যতা-সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ইট, পাথর, কাগজ, কাপড়, লোহা ও সীসায়। যুদ্ধের ময়দান, কোর্ট-কাছারী, খেলাধুলা ও বিনোদন বিলাসিতার আসরগুলো হবে তাদের কেন্দ্র এবং এসব কেন্দ্রে তারা তাদের আসর জাঁকিয়ে বসবে এবং নরক গুলযার করবে। হৃদয় ও আত্মা, মানুষের নৈতিক চরিত্র, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন তাদের প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকবে। সেখানে তাদের ও পশুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। সভ্যতা-সংস্কৃতির অবস্থা হবে সেই দেহের ন্যায় যার ভেতর অস্বাভাবিক স্থূলত্ব থাকবে অর্থাৎ শরীর হবে ফোলা মাংসের স্তূপের ন্যায় যার দরুন তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত সুন্দর ও স্বাস্থ্যবানই মনে হোক না কেন, ভেতরগত দিক দিয়ে তা হবে নানা রকম রোগ-ব্যাধির আখড়া এবং বিভিন্ন প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণার শিকার। তার হৃদয় হবে দুর্বল ও শোকার্ত এবং তার স্বাস্থ্য হবে ভারসাম্যহীন।

এর বিপরীতে যদি সেই দল বিজয়ী হয় যারা আদপেই বস্তুবাদকে স্বীকার করে না, এর প্রতি উদাসীন ও নির্বিকার, কেবল আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতি-পরবর্তী সত্যের প্রবক্তা, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ জীবনবিমুখ ও নেতিবাচক তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতি তার সতেজ ও মানুষ তার প্রকৃতিগত সামর্থ্য হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবে। এরূপ নেতাদের প্রভাবে মানুষ প্রান্তরবাসী ও গুহাবাসী জীবন এখতিয়ার করবে। নাগরিক জীবনের ওপর গুহাবাসের জীবনকে, তার অবিবাহিত জীবনকে দাম্পত্য জীবন যাপনের ওপর প্রাধান্য দেবে। এমতাবস্থায় আত্মনিপীড়ন প্রশংসনীয় বিবেচিত হয় যাতে দেহ দুর্বল এবং আত্মা পবিত্র ও সবল হয়ে যায়। লোকে জীবনের ওপর মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেয় যাতে করে বস্তুবাদের কোলাহল থেকে বেরিয়ে রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার শান্ত সমাহিত অঞ্চলে পৌঁছে যায় এবং সেখানে পূর্ণতার শিখরে উপনীত হয়। এজন্য যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস মতে এই বস্তুজগতে মানুষের পক্ষে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর মরণদশা চেপে বসে, শহর-বন্দর

বিরান এলাকায় পরিণত হতে থাকে এবং জীবনের শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্ততায় রূপ নেয়। কেননা এই মূলনীতি ও আকীদা-বিশ্বাস মানব প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সেজন্য মানব-প্রকৃতি থেকে থেকেই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে এবং এর প্রতিশোধে এমন পাশবিক বস্তুবাদী পন্থা গ্রহণ করে যার ভেতর রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা ও আখলাক-চরিত্রের সঙ্গে কোনরূপ উদারতা প্রদর্শন করা হয় না। ফলশ্রুতিতে মনুষ্যত্ব ও মানবতার জায়গায় পশুত্ব কিংবা বিকৃত মানবতার আবির্ভাব ঘটে। কখনো এমন হয় যে, এই সংসারবিরাগী দলের ওপর কোন শক্তিশালী বস্তুবাদী দল আক্রমণোদ্যত হয় এবং প্রথমোক্ত দল নিজেদের স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে এর মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে শেষাবধি আক্রমণোদ্যত দলের সামনে আত্মসমর্পণ করে বসে। অথবা সংসারবিরাগী দল স্বয়ং নিজেরাই জাগতিক ও পার্থিব ব্যাপারগুলো সামলানোর মধ্যে ঝামেলা অনুভব করে বস্তুবাদ কিংবা বস্তুবাদী দলের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয় তাদের নিকট সমর্পণ করে নিজেরা ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় প্রথা-পর্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতা মতবাদ জন্মলাভ করতে থাকে। ফলে রূহানিয়াত ও আখলাক-চরিত্র দিন দিন প্রভাব শূন্য ও কর্মমুখর জীবন থেকে বিদায় নিতে থাকে, এমন কি মনুষ্য সমাজ এর নিয়ন্ত্রণ থেকে একেবারেই মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। জীবন নির্ভেজাল বস্তুবাদী জীবনে পরিণত হয়ে যায় এবং ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতা কেবল একটি ছায়াসর্বস্ব বস্তুতে পরিণত হয় কিংবা ভুল দর্শন হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। দুনিয়ার খুব কম সংখ্যক দলই (যারা মানব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে , দিয়েছে পথ-নির্দেশনা) এই দোষ থেকে মুক্ত ছিল। হয়তো তারা নিরেট বস্তুবাদী ছিল অথবা ছিল নির্ভেজাল সংসারবিরাগী। এজন্য মানব সভ্যতা তার অধিকাংশ সময় পাশবিক বস্তুবাদ ও সংসারবিরাগী– আধ্যাত্মিকতার মাঝে দোদুল্যমান থেকেছে এবং মানুষের জীবন-তরণী দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খেয়েছে। কখনো বস্তুবাদ হয়েছে বিজয়ী, আবার কখনো বিজয় লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতা তথা রূহানিয়াত। মানবতার ভাগ্যে ভারসাম্য ও সামগ্রিকতা জুটেছে খুব কমই।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর বৈশিষ্ট্য

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা ধর্ম ও নৈতিকতা এবং শক্তি ও রাষ্ট্রনীতির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এসবের বিক্ষিপ্ত গুণাবলী তাঁদের মধ্যে একই সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে মানবতা সকল

শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যসহ দৃশ্যমান ছিল। এই নৈতিক, চারিত্রিক ও উন্নততর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এইরূপ বিস্ময়কর ও অনন্যভারসাম্য (যা মানুষের মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয়), এরকম অস্বাভাবিক ব্যাপকতা যার উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই মেলে এবং এরপর পরিপূর্ণ বস্তুগত প্রস্তুতি ও বিস্তৃত জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে এটা সম্ভব ছিল যে, তাঁরা মানব সম্প্রদায়গুলোকে তাদের উন্নততর আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বস্তুগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। অনন্তর আমরা ইতিহাসে খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে বেশি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও সফল কোন যুগের সন্ধান পাইনা এই যুগে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক, ধর্মীয় ও জ্ঞানগত এবং রূহানী উপায়-উপকরণাদি ইনসানে কামিল ও সুস্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগী ছিল, ছিল সাহায্যকারী। এই হুকুমত যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হুকুমতগুলোর অন্তর্গত ছিল এবং এরকম রাজনৈতিক বস্তুগত শক্তি সহকারে যা সমকালীন সমস্ত শক্তির মুকাবিলায় শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী ছিল, উন্নততর নৈতিকতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতো, বিবেচিত হতো নৈতিক শিক্ষামালা, জীবন-যিন্দেগী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার তুলাদণ্ড হিসেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে নৈতিক চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বও তার শীর্ষ বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল। বিজয়ের ব্যাপ্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির সাথে সাথে নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতিও অব্যাহত ছিল। অনন্তর ইসলামী হুকুমতের অস্বাভাবিক বিস্তৃতি, জনসংখ্যার চরম বৃদ্ধি, আরাম-আয়েশ ও বিলাসী দ্রব্যসামগ্রী ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য ও আকষর্ণ সত্ত্বেও অপরাধমূলক ও অনৈতিক কার্যকলাপের ঘটনা খুব কমই ঘটত। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্ময়কর রকম উত্তম ছিল। এটি ছিল এক আদর্শ যুগ যার চাইতে উন্নততর যুগের কথা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এবং এর চাইতে অধিকতর মুবারক ও প্রাচুর্যপূর্ণ যমানার কথা কল্পনায়ও আসেনি।

এ ছিল কেবল সেসব লোকের জীবন-চরিত্রের অমীয় ফসল যাঁরা হুকুমত পরিচালনা করতেন এবং যাঁরা ছিলেন সভ্যতা-সংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক। ফসল ছিল তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, সরকার পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতির মৌলনীতিমালার এজন্য যে, তাঁরা যেখানেই থাকতেন এবং যে অবস্থায় থাকতেন, ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম নমুনা হতেন। তাঁরা শাসক হিসেবেই থাকুন অথবা সাধারণ একজন কর্মচারী হিসেবে, পুলিশই হোন অথবা সৈনিক, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি, আল্লাহভীরু ও বিনয়ী হিসেবেই পাওয়া যেত।

জনৈক রোমক সর্দার নিম্নোক্ত ভাষায় মুসলিম সৈনিকদের প্রশংসা করেছেন:

রাত্রিবেলা তুমি তাঁদেরকে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল দেখবে আর দিনের বেলা দেখবে রোযাদার হিসেবে, প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসেবে। তাঁরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়।'[১]

অন্যজন নিম্নোক্ত ভাষায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

"দিনের বেলা তাঁরা ঘোড়সওয়ার মর্দে মুজাহিদ আর রাতের বেলা ইবাদতগুযার। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য দিয়ে আহার্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে যে, শত্রু নিপাত করেই ছাড়ে।"[২]

তৃতীয় আরেকজন নিম্নোক্ত ভাষায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর প্রশংসা করেছেন ঃ

'রাত্রিকালে দেখলে দেখতে পাবে যেন দুনিয়ার সাথে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই এবং ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজই নেই। আর দিনের বেলা তাঁদের দেখতে পাবে তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন, মনে হবে যেন এটাই তাঁদের একমাত্র কাজ। শ্রেষ্ঠতম ও নিপুণ তীরন্দায, বল্লম নিক্ষেপকারী হিসেবে তাঁদের কোন জুড়ি নেই। আল্লাহ্র স্মরণে তাঁরা এমন মগ্ন ও সরব যে, তাঁদের মজলিসে কারুর কথা শোনাও দুষ্কর।'[৩]

এই নৈতিক প্রশিক্ষণের ফল হয়েছিল এই যে, মাদায়েন বিজয়ের পর পারস্য সম্রাট কিসরার মণি-মুক্তা ও হীরকখচিত রাজমুকুট এবং বসন্তকালের দৃশ্য-শোভিত গালিচা যার মূল্য ছিল লক্ষ আশরাফী যা একজন সাধারণ সৈনিকের হস্তগত হয়। কিন্তু কি সাধ্য যে সে আত্মসাৎ করবে। সৈনিক এগুলো তার কমান্ডারের কাছে সোপর্দ করে এবং কমান্ডার সেটা খলীফা ওমর (রা)-এর কাছে পৌঁছে দেন। খলীফা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং বলেন, যে সমস্ত লোক এগুলো কমান্ডারের হাতে তুলে দিয়েছে তাঁদের আমানতদারী প্রশংসনীয় বটে।[৪]

জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা

আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসারী এই প্রথম দলটি এমনই ছিলেন যে, তাঁদের ছায়ায় ও তাঁদের হুকুমতে মানবগোষ্ঠী পরিপূর্ণ

১. আহমদ ইবন মারওয়ান মালেকী বর্ণিত; ২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.
৩. প্রাগুক্ত ১৬ পৃ.।
৪. সীরাত-ই ওমর ইবনু'ল-খাত্তাব, ইবনে জওযী কৃত।

সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ করে এবং তাঁদের নেতৃত্বে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই যথাযথ স্থানে পড়ে এবং যথার্থ মনযিলের দিকেই উত্থিত হয়। পৃথিবী সর্ব প্রকার প্রশান্তি, তুষ্টি ও প্রাচুর্য, কল্যাণ ও বরকত লাভ করে। মানুষের কল্যাণ সাধন, তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ যত্নবান। তাঁরা কোন কোন ধর্মানুসারীদের ন্যায় পার্থিব জীবনকে অভিশাপের বেড়ি মনে করতেন না। আবার তাঁরা একে আরাম-আয়েশ ও আনন্দ উপভোগের সর্বশেষ সুযোগ বলেও মনে করতেন না, বরং তাঁরা এর এক একটি মিনিটকে দামী মনে করতেন। এর সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রী ও নেয়ামতরাজিকে অন্য কোন দিনের জন্য তুলে রাখতেন না। ঠিক তেমনি তাঁরা এই জীবনকে কোন সাবেক আমলের কৃত পাপের শাস্তিস্বরূপ অনিবার্য বিধিলিপিও মনে করতেন না। অধিকন্তু বস্তুপূজারী জাতিগুলোর ন্যায় তাঁরা দুনিয়াকে লুটের মালও মনে করতেন না যার ওপর বুভুক্ষের ন্যায় হুমড়ি খেয়ে পড়বেন এবং যমীনের বুকে মজুদ সম্পদ ও ধনভাণ্ডারকে তাঁরা লাওয়ারিশ মালও মনে করতেন না যা লুট করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁরা পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলোকে শিকার ভাবতেন না যা শিকার করবার জন্য অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। তাঁদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, এই জীবন আল্লাহ্র দেয়া এক নেয়ামত যার মধ্যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার এবং মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবার তাঁদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, অবকাশ দেওয়া হয়েছে কাজের ও চেষ্টা-সাধনার, যার পরে তার জন্য আর কোন অবকাশ নেই।

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করবার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?" (সূরা মুল্ক: ২ আয়াত)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, ওদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা কাহফ :৭)

তাঁরা এই জগতকে আল্লাহ্র রাজ্য মনে করতেন যেখানে আল্লাহ তাঁদেরকে প্রথমত মানুষ, অতঃপর মুসলমান হিসেবে আপন প্রতিনিধি ও পৃথিবীবাসীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِىْ الاَرْضِ جَمِيْعًا -

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৯)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا۔

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, ওদেরকে উত্তম রিয্‌ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ ۢبَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا۔

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।" (সূরা নূর : ৫৫)

তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সম্পদ থেকে কোনরূপ অপচয় না করে ও বাহুল্য ব্যয় না করে উপকৃত হবার অধিকার দিয়েছেন।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۔

"আহার করবে, পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফ: ৩১)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ۔

"বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলুন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।"(সূরা আ'রাফ: ৩২)

তাঁদেরকে দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা আদিষ্ট যে, তাঁরা তাঁদের জীবনের গতি, চরিত্র ও প্রবণতার পর্যালোচনা করতে থাকবেন, খতিয়ান গ্রহণ করবেন, যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে তাদেরকে তাঁরা সিরাতে মুস্তাকীমে টেনে আনবেন, যারা সীমা অতিক্রম করবে তাদের ভারসাম্যময় সীমারেখার মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন, বক্রতা দূর করবেন, ফাঁক-ফোকর পূর্ণ করতে থাকবেন, শক্তিমানের কাছ থেকে দুর্বলের হক আদায় করে দেবেন, জালেম থেকে মজলুমের ইনসাফ করাবেন এবং আল্লাহর যমীনে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার কায়েন রাখবেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের জন্য নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর আর আল্লাহ্য় বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ۔

" হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ।" (সূরা নিসা: ১৩৫)

একজন য়ূরোপীয় নও মুসলিম পণ্ডিত (মুহাম্মদ আসাদ) মুসলমানদের এই বৈশিষ্ট্যকে, জীবন সম্পর্কে এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি ঃ

"ইসলাম খ্রিস্ট ধর্মের মত দুনিয়াকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে না। ইসলামের প্রদত্ত শিক্ষামালা এই যে, আমরা পার্থিব জীবনের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় যেন বাড়াবাড়ি না করি। খ্রিস্ট ধর্ম পার্থিব জীবনের নিন্দা করে এবং এর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করে। বর্তমান য়ূরোপ তথা পাশ্চাত্য জগত খ্রিস্ট ধর্মের মূল প্রাণসত্তার পরিপন্থী জীবনের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন কোন ক্ষুধার্ত মানুষ দীর্ঘ অনাহারের পর আহার্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে খাবার গোগ্রাসে গিলতে থাকে বটে, কিন্তু তাকে সে মর্যাদা দিতে জানে না। ইসলাম এই উভয়টির বিপরীতে জীবনকে প্রশান্তি ও সম্মানের দৃষ্টিতে

দেখে। সে জীবনকে পূজা করে না, বরং এক উচ্চতর জীবনের পথে একটি অপরিহার্য মনযিল বলে গণ্য করে। সেজন্য মানুষের পক্ষে একে উপেক্ষা করা কিংবা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা এবং এই পার্থিক জীবনকে অসম্মান করা ও অমর্যাদা করা অনুচিত। জীবনের সফরে আমাদের এই দুনিয়া অতিক্রম করে যেতে হবে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা নির্ধারিত হয়েই আছে। সুতরাং মানুষের জীবনের বিরাট মূল্য রয়েছে। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা কেবল একটা মাধ্যম ও যন্ত্রমাত্র। এর মূল্য কেবল ততটুকুই যতটুকু মূল্য হয় মাধ্যম ও যন্ত্রের; এর বেশি নয়। ইসলাম এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে না যে, আমার রাজত্ব কেবল এই দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ এবং সে খ্রিস্ট ধর্মের এই ধারণাও সমর্থন করে না যে, আমার রাজত্ব এ পার্থিব জীবন নয়। আর তাই সে পার্থিব জীবনকে অবজ্ঞা করে। ইসলাম এই দুই চরম প্রান্তিক মতবাদের বিপরীতে মধ্যম পন্থার অনুসারী হিসেবে এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে। কুরআনুল করীম আমাদেরকে এই ব্যাপক অর্থপূর্ণ দো'আ করতে শেখায় ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً۔

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও।" (সুরা বাকারা : ২০১)

'এই দুনিয়া ও এর যাবতীয় বস্তুসামগ্রীকে সম্মান প্রদান কোনভাবেই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রয়াস ও আত্মিক চেষ্টা-সাধনার পথের প্রতিবন্ধক নয়। বস্তুগত উন্নতি- অগ্রগতি ও প্রাচুর্য পরম কাঙ্ক্ষিত যেমন নয় তেমনি নয় অনাকাঙ্ক্ষিত। আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যেন এমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা ও উপকরণ সৃষ্টি হয় এবং এমন পরিবেশ কায়েম হয়ে যায় আর তেমন অবস্থা ও পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আমরা তা কায়েম রাখব যা মানুষের নৈতিক শক্তির উন্নতি ও ক্রমবিকাশে সহায়ক হতে পারে। এই মূলনীতি অনুসারে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে চায়। ইসলামের ধর্মীয় বিধান বাইবেলের এই বিভাজনকে আদৌ সমর্থন করে না, "সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও আর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।" কেননা ইসলাম আমাদের জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনগুলোকে নৈতিক ও কার্যকর প্রকরণসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নয়। ইসলামের মতে যে কোন একটি বাছাইয়ের অধিকার রয়েছে আর তাহলো এই যে, সে হয় সত্যকে গ্রহণ করবে অথবা মিথ্যাকে, হয় সে হক বেছে নেবে নয়তো বাতিলকে। এর মাঝামাঝি বলে কিছু

নেই। এজন্য সে আমল তথা কর্মের ওপর জোর দেয়। কেননা তা নৈতিকতারই অংশ বিশেষ। ইসলামী শিক্ষামালার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে পরিবেশ ও চতুষ্পার্শ্বের ঘটনাবলীর ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে দায়ী ও জওয়াবদিহি করার দায়িত্বশীল ও ধর্মীয় চেষ্টা-সাধনার নিমিত্ত আদিষ্ট এবং প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার উৎসাদনের জন্য দায়িত্বশীল ভাবতে হবে। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্য় বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে-ইমরান: ১১০)

"এটা ইসলামের আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে ইসলামের প্রাথমিক বিজয় এবং ইসলামী রাজতন্ত্রকে নৈতিক যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। অনন্তর ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী একথাই যদি কেউ বলতে চায়, তাহলে ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীই ছিল। কিন্তু এ সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদের স্পৃহাতাড়িত নয় কিংবা তা অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থপরতাসঞ্জাতও নয়। ইসলামের প্রথম যুগের মুজাহিদবৃন্দকে যে জিনিস যুদ্ধের মাঠে টেনে নিয়ে যেত বড়ই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তা অপরের সম্পদ ও পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রীর বিনিময়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লোভ বা লালসায় নয়। তাঁদের লক্ষ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, এমন এক পার্থিব কাঠামো নির্মাণ করতে হবে, যেখানে মানুষের জন্য সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ লাভ সম্ভব হয়। ইসলামী শিক্ষামালার দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা ও মর্যাদার জ্ঞান মানুষের কাছে নৈতিক দায়িত্ববোধের দাবি জানায়। এটা আত্মমর্যাদাহীনতার ব্যাপার যে, মানুষ ভাসাভাসাভাবে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য করবে, এরপর সত্য ও ন্যায়ের উন্নতি এবং অন্যায় ও অসত্যের ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করবে না। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ যদি ন্যায় ও সত্যের বিজয় ও হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দৌড়-ঝাঁপ করে তাহলে তা জীবন লাভ করে এবং ফলেফুলে শোভিত হয়। আর যদি এর সাহায্য করতে ও শক্তি যোগাতে কার্পণ্য করে এবং এর সাহায্য-সমর্থনে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে তার পতন ঘটবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।"[১]

১. Islam At the Cross Roads, by Mohammad Asad, fomerly Leopold Weiss, p. 26-29.

ইসলামী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

হিজরী ১ম শতকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি তার পরিপূর্ণ রূহ ও দৃশ্যপটসমূহসহ আবির্ভাব এবং ইসলামী হুকুমতের নিজস্ব রূপ ও রীতিনীতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল ধর্ম ও নৈতিকতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সভ্যতার গতিধারাই পাল্টে যায়। ইসলামের এই বিরাট আজীমুশ্শান বিজয়ে জাহিলিয়াত এক অভূতপূর্ব পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হয়। এতদিন পর্যন্ত তার প্রতিপক্ষের (ইসলাম-এর) অবস্থানগত মর্যাদা একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আহ্বানের বেশি ছিল না। এখন হঠাৎ করেই হয়ে গেল সৌভাগ্য ও মুক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের পরিপূর্ণ সমন্বয়, জীবন ও শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা-সংস্কৃতি, একটি সমাজ, একটি শক্তিশালী হুকুমত এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংবিধান।

এখন একদিকে ছিল এমন একটি যৌক্তিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও আমল উপযোগী ধর্ম যা ছিল সরাসরি প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর, আর অপর দিকে ছিল কেবলই কষ্ট-কল্পনা ও আজগুবী কিসসা-কাহিনী। একদিকে ছিল আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়ত ও আসমানী ওহী, আর এর বিপক্ষে ছিল শুধুই অনুমান, নিছক মানবীয় অভিজ্ঞতা ও মানবরচিত আইন-কানূন।

একদিকে ছিল এমন শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি যার বুনিয়াদ অনড় অটল এবং যার মূলনীতি অপরিবর্তনীয়। আল্লাহভীতি, সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার রূহ এর সমগ্র রীতিনীতি ও বিধিমালাতে সক্রিয় ছিল। এর বৃত্ত ও পরিধির মধ্যে সম্পদ ও সম্মানের মুকাবিলায় নৈতিকতা ও সাধুতা এবং শূন্যগর্ভ আড়ম্বর প্রদর্শনীর মুকাবিলায় প্রাণসত্তা ও মৌলিকত্বের সম্মান ও মূল্যের প্রাধান্য ছিল। লোকের ভেতর সাম্য ছিল, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের একমাত্র মানদণ্ড ছিল তাকওয়া। মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আখিরাত। এজন্য তাদের স্বভাবে প্রশান্তি এবং অন্তরে তুষ্টি ছিল। পার্থিব সামান-আসবাবের লোভ ও এ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মধ্যে খুব সামান্যই ছিল। এর বিপক্ষে ছিল জাহেলী সভ্যতা, ছিল গোলযোগপূর্ণ, উত্তাল সংঘাতক্ষুব্ধ অস্থিরতা। বড়রা ছোটদের ওপর জুলুম করত এবং সবল দুর্বলকে গ্রাস করত। খেল-তামাশা ও চরিত্রহীনতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং পদ ও সম্পদ, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ছিল কঠিন প্রতিযোগিতা। এমন কি এর ফলে পৃথিবী একটি রণক্ষেত্রে এবং জীবন-যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে ছিল ন্যায়বিচারক ইসলামী হুকুমত যা আপন প্রজাদেরকে একই দৃষ্টিতে দেখত।

দুর্বলকে শক্তিমানের কাছ থেকে তার হক নিয়ে দিত। লোকে যেমন নিজের ঘরবাড়ি ও জানমালের হেফাজত করে তেমনি ইসলামী হুকুমত তার প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের দেখাশোনা ও হেফাজত করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করত। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল তাদের শাসকবৃন্দ এবং সর্বাধিক যুহ্দ তথা ভোগবিমুখ জীবন ছিল তাদের যাদের নিকট সর্বাধিক আরাম-আয়েশের উপকরণ ও ভোগ-বিলাসের অবারিত সুযোগ ছিল। এর মুকাবিলায় ছিল সেসব জাহেলী হুকুমত যেখানে জুলুম-নিপীড়নের অবাধ রাজত্ব ছিল। যে সব হুকুমতের কর্মকর্তারা জনগণের সহায়-সম্পদ আত্মসাৎ করত ও জুলুম-নিপীড়ন চালাত। লোকের সম্ভ্রম হানি ঘটাতে ও রক্তপাত করতে তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামত এবং নিজেদের অসৎ চরিত্রের নমুনা পেশ করে জনগণের নৈতিক চরিত্র খারাপ করে দিত। তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ছিল শাসক ও বাদশাহরা। তাদের রাজত্বে লোকে ক্ষুধায় না খেয়ে মারা যেত। আর তাদের জীব-জানোয়ার, এমন কি কুকুরগুলোও পেট পুরে খেত। তাদের মহলগুলো মূল্যবান স্বর্ণখচিত পর্দা দ্বারা সজ্জিত থাকত আর ওদিকে শরীর ঢাকার মত এক চিলতে কাপড়ও থাকত না সাধারাণ মানুষের।

তারপর লোকের সামনে ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোন বাধা ছিল না, ছিল না জাহিলিয়াতকে অগ্রাধিকার দেবার কোন কারণ। ইসলাম কবুল করতে গিয়ে তাদের আর হারাবারও কিছু ছিল না, অথচ হাসিল হচ্ছিল সব কিছুই। ঈমানের মিষ্টতা, ইয়াকীনের শীতলতা, ইসলামের শক্তি-সামর্থ্য ও বলবীর্য, একটি শক্তিশালী হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এমন সব বন্ধু ও সাহায্যকারীদের সাহায্য সমর্থন তারা লাভ করছিল যারা তাদের জন্য প্রয়োজনে নিজেদের জানমাল লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকত। চিত্তের প্রশান্তি ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থা ও তৃপ্তি লাভ ঘটত। মানুষ অনায়াসে জাহিলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে লাগল। তারা মুসলমান হতে লাগল। জাহিলিয়াতের এলাকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকল এবং ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা দৃঢ় ও সুসংহত হতে লাগল, এমন কি দুর্বল-চেতা লোকদের মনেও ইসলাম ও কুফর সম্পর্কে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। ফলে নির্ভেজাল আল্লাহ্র আনুগত্য করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল।

এই বিপ্লবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া খুবই সুদূরপ্রসারী ও গভীর ছিল। আল্লাহ্-পরস্তীর রাস্তা যা জাহিলী হুকুমতে কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল ছিল, এখন তা খুবই সহজগম্য ও নিরাপদ হয়ে গেল। জাহিলিয়াতের পরিবেশে যেখানে আল্লাহ্র আনুগত্য কঠিন ও কষ্টকর ছিল, ইসলামী পরিবেশে সেখানে আল্লাহ্র নাফরমানী

করা কঠিন ও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এই গতকাল পর্যন্ত প্রকাশ্য সমাবেশে খোলা মাঠে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা দিয়ে পাপাচারের দিকে, অন্যায়-অশ্লীলতার দিকে, জাহান্নাম অভিমুখে আহ্বান জানানো হত, সেখানে আর এমনটি করা সহজ ছিল না, বরং সুকঠিন ছিল। গতকাল অবধি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও তাঁর নাফরমানীর কার্যকারণ ও সুযোগ ছিল অবাধ ও অসংখ্য আর তা ছিল খোলাখুলি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে। আর এখন এর ওপর বিরাট বাধ্যবাধকতা আরোপিত ও বড় রকমের বাধা-প্রতিবন্ধকতা স্থাপিত। কাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌রই যমীনে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো ও দাওয়াত প্রদান এমন এক অপরাধ ছিল যার ফলে দাঈ ও মুবাল্লিগকে অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ দরকার পড়ত। আর আজ তা এমন এক শুভ কর্ম ছিল, কল্যাণকর কাজ ছিল যার জন্য কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। দাওয়াত প্রদানকারীর কোন প্রকার বিপদ যেমন ছিল না, তেমনি বিপদ ছিল না কবুলকারীরও। কুরআন মজীদে এই পার্থক্যটাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে এভাবে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

"আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ রিযিকরূপে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা আনফাল : ২৬)

এই ক্ষমতা ও শক্তির কারণে মুসলমানরা এখন শাব্দিক অর্থেই আমরূ বি'ল-মারুফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকে এবং আদেশ ও নিষেধ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে।

যেভাবে বসন্ত মৌসুমে উদ্ভিদ জগত ও মানুষের মেযাজ মৌসুম দ্বারা প্রভাবিত হয়, ঠিক তেমনি অনুভূত ও অননুভূত পন্থায় মুসলিম শাসন ও সভ্যতার যুগে মানুষের মন-মানসিকতাও পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হতে থাকে। চিত্তে কোমলতা ও নম্রতা সৃষ্টি হতে থাকে। ইসলামের মৌল নীতিমালা ও সত্য বাণী মন ও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হতে থাকে। বস্তুর মূল্য ও মান সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। গতকাল পর্যন্ত যে সব বস্তু ও গুণাবলী মানুষের দৃষ্টিতে বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত ছিল আজ আর তা তেমন থাকল না। আর যে সব বস্তু

গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন ছিল আজ তা গুরুত্ববহ ও মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হলো এবং এর অনুসারী ও পূজারীদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হলো। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, এর অভ্যাস, রীতিনীতি ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এখতিয়ার করা গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়া ক্রমান্বয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছিল। পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষ যেমন সূর্যের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না ঠিক তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও এর মানুষগুলো নিজেদের ইসলামী প্রবণতা ও ইসলামের অভ্যন্তরীণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুভব করতে পারত না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনকিছুই এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। মানুষের বিবেক ও তার অন্তর এসব প্রভাবের সাক্ষ্য দিত এবং তাদের সুকুমার বৃত্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটত। মুসলমানদের পতনের পরও যে সব সংস্কার আন্দোলন ঐসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয় তা ইসলামী প্রভাব ও ইসলামী ধ্যান-ধারণারই ফলস্বরূপ।

ইসলাম তৌহীদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করে এবং মূর্তিপূজা ও শির্ক-এর এমন নিন্দা জ্ঞাপন করে যে, এগুলো চিরদিনের জন্য হেয় ও অবজ্ঞেয় হয়ে যায়। লোকে অতঃপর এর নামে লজ্জা পেত এবং নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করত অথবা তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও সাফাই সহকারে এর স্বীকৃতি দিত এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বলত :

اَجَعَلَ الاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ط اِنَّ هٰذَا شَيْئٌ عُجَابٌ۔

"সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!" (সূরা সাদ : ৫)

অথবা এখন তারা নিজেদের ধর্মের শির্কমূলক অঙ্গসমূহ ও কর্মকাণ্ডের ভিন্নতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করতে থাকে এবং এমন সব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে থাকে যদ্দারা সেগুলোকে তৌহীদ তথা একত্ববাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন একটি দলের উৎপত্তি ঘটে যারা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-এর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান এবং ত্রিত্ববাদের আকীদাকে তৌহীদের মোড়কে ব্যাখ্যা দিত। তাদের মধ্যে এমন সব সংস্কারকেরও জন্ম হয় যারা খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় দল-উপদল ও গির্জাধিপতিদের আল্লাহ ও তদীয় বান্দার মধ্যে মাধ্যম হিসাবে অস্বীকার করত, তাদের কঠিন ভাষায় সমালোচনা করত এবং তাদের বিশিষ্ট অধিকারগুলোকেও তারা অগ্রাহ্য করত। খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীতে য়ূরোপে এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যারা

পাদ্রীদের সামনে নিজেদের কৃত গোনাহর স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতা করত এবং যাদের আহ্বান ছিল এই যে, একমাত্র আল্লাহর সকাশেই দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং নিজের পূর্বকৃত গোনাহ ও পাপরাজির স্বীকৃতি কেবল তাঁর সামনেই দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।[১]

ঠিক তেমনি খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত যূরোপে এই আন্দোলন প্রবল শক্তিতে পরিচালিত হয় যে, ছবি ও মূর্তি একটি ধর্মবিরোধী কাজ এবং এসবের মধ্যে পবিত্রতার কোন কিছু নেই। এই আন্দোলন এত প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে যে, তৃতীয় লুই, কনস্টান্টাইন ৫ম ও চতুর্থ লুই-এর মত প্রবল প্রতাপান্বিত রোমক সম্রাটরা পর্যন্ত একে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।। প্রথমোল্লিখিত সম্রাট ৭২৬ খ্রিস্টাব্দে এক রাজকীয় ফরমান জারি করে সরকারীভাবে চিত্র ও মূর্তির পবিত্রতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফরমানে একে তিনি মূর্তিপূজা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজক যূরোপ এবং রোমক ও গ্রীক সভ্যতায় (যার চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও মূর্তি নির্মাণ পৃথিবী বিখ্যাত) চিত্র ও মূর্তির বিরুদ্ধে এই অনীহা ও জিহাদ নিশ্চিতই ইসলামের মূর্তি ভাঙা ও তৌহিদী ঘোষণার উচ্চকিত নাদই ছিল যা' পাশ্চাত্যে মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রভাবাধীনে পৌঁছে। এর সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যাবে যে, তুরিযানের প্রধান পাদ্রী-পুরোহিত এবং এই আন্দোলন ও দাওয়াতের বিরাট এক উৎসাহী সমর্থক ও পতাকাবাহী ক্লডিয়াস (যিনি তাঁর প্রভাবাধীন এলাকাতে চিত্র ও ক্রুশ কাষ্ঠ পুড়িয়ে ফেলতেন) সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, তাঁর জন্ম ও লালন -পালন স্পেনে হয়েছিল এবং এটা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা যখন সেখানে মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতা উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছিল।[২]

যূরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও খ্রিস্টীয় গির্জার কাহিনী যদি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের আরও অনেক নমুনা ও দৃষ্টান্ত আপনি দেখতে পাবেন। স্বয়ং মার্টিন লুথার কিং-এর বিখ্যাত সংস্কারমূলক আন্দোলন তার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেছেন, এই আন্দোলনের জনকের ওপর ইসলামী শিক্ষামালার প্রভাব পড়েছিল। কেবল ধর্মই নয়, বরং যূরোপের সমগ্র জীবন ও এর সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Brifault) তাঁর The Making of Humanity নামক গ্রন্থে বলেন:

১. বিস্তারিত দ্র. দুহাল ইসলাম, সালাহুদ্দীন খোদা বখ্‌শ-এর বরাতে; ২. প্রাগুক্ত।

"For Although, there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic civilization is not traceable nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory—natural science and scientific spirit."

"যূরোপের উন্নতি ও অগ্রগতির কোন শাখা-প্রশাখা কিংবা কোন একটি দিকই এমন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতা তার ছাপ না রেখেছে কিংবা কোন প্রকার প্রভাব না ফেলেছে, উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বলতর কোন স্মৃতি না রেখেছে। যূরোপীয় জীবনের ওপর ইসলাম এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে।"[১]

একই লেখক অন্যত্র বলেন ঃ

"Science is the most momentous contribution of Arab Civilization to the modern world...It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life."

"কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই (যেক্ষেত্রে আরব মুসলমানদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত) যূরোপে জীবন সঞ্চারের কৃতিত্বের অধিকারী নয়, বরং ইসলামী সভ্যতা যূরোপীয় জীবনের ওপর খুবই বিরাট ও বিভিন্নমুখী প্রভাব ফেলেছে। আর এর সূচনা সে সময়ই হয়ে যায় যখন ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম আলোকচ্ছটা যূরোপের ওপর পড়া শুরু করেছে।"[২]

আর এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর চরিত্র ও আচার-ব্যবহার, সমাজ ও আইন প্রণয়নে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও শরীআর প্রভাব চোখে পড়বে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তার অধিকারসমূহের স্বীকৃতি, বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় ও দল-উপদলের মধ্যে সাম্যের মৌল নীতিমালা মুসলিম বিজয় এবং মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার পর থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মোটের ওপর সভ্য দুনিয়ার কোন ধর্ম ও কোন সভ্যতাই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওত লাভ ও ইসলামের আবির্ভাবের পর এই দাবি করতে পারে না যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয়নি।

ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী সভ্যতার পতন যুগেও ইসলামের আগেকার আহ্বান (দাওয়াত) ও শক্তির প্রভাব-পরিচিতি ও স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। এসবের

১. The Making of Humanity, P. 190.
২. The Making of Humanity, P. 202.

মধ্যে একটি ছিল আল্লাহ্‌র পরিচিতি যা সমগ্র মুসলিম জগতে সাধারণ ব্যাপার ছিল। আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল মুসলমানদের মন ও মস্তিষ্কের গভীরে এভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তা সর্বপ্রকার বিপ্লব, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ধর্মীয় অধঃপতন সত্ত্বেও বের হয়ে যায়নি, বের হতে পারেনি। মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল (মুসলমানদের পতন যুগে যা সুস্পষ্টভাবেই দেখা গেছে) কিন্তু আল্লাহ্‌র ধ্যান-খেয়াল তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে বের হতে পারেনি। নফসে লাওয়ামার ভর্ৎসনা, বিবেকের দংশন ও চোখ রাঙানি, সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির ধারণা, পরকালের ভয়ভীতি, অন্যায় ও পাপের নেশায় মত্ত আত্মবিস্মৃত অবস্থায়ও অন্তরে উঁকি মারত এবং কখনো কখনো অলক্ষ্যে তার কাজ করে যেত। এরই ফলে ফাসেক ও ফাজির পাপিষ্ঠ বদকাররাও অনেক সময় হঠাৎ করেই অন্যায় ও পাপাচার থেকে তওবাহ করে অত্যন্ত নেককার মুত্তাকী দলভুক্ত হয়ে যেত। শুঁড়িখানার মদ্যপরাও একটি ঠোক্কর খেয়ে সতর্ক সাবধান হয়ে কা'বার পথ ধরত। বড় বড় শাহযাদা ও বিলাস ব্যসনে লালিত-পালিত আমীর-নন্দন একটা মামুলী ধরনের অদৃশ্য সাবধান বাণী দ্বারা (যার থেকে সহস্র গুণ বেশি সাবধান বাণী বস্তুবাদ ও কুফরের যুগে প্রতিক্রিয়াহীন প্রমাণিত হয়ে থাকে) সিংহাসন ও রাজমুকুট ছেড়ে ফকীরী দরবেশীর ভোগবিমুখ তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করতেন। কোন কোন সময় কুরআন পাঠকারী কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করেছে ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ -

“যারা ঈমান আনে তাদের ঈমান ভক্তি বিগলিত হবার সময় কি আসেনি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত যেন ওরা না হয় বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (সূরা হাদীদ : ১৬)

কোন কোন লোকের ব্যাপারে জানা গেছে, ঘুম থেকে জেগেই এমন সতর্ক ও সাবধান হয়ে গেছেন যে, তাঁদের জীবনে চিরদিনের জন্য বিপ্লব ঘটে গেছে।” ইতিহাসের পৃষ্ঠা যাঁদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভরপুর আছে।

বাগদাদের চরম ভোগ-বিলাস ও গাফিলতির যুগেও প্রভাব সৃষ্টিকারী ওয়ায়েজ ও সাহিবে দিল নসীহতকারীদের মজলিস ও মাহফিলগুলো কদাচিৎ এ ধরনের ঘটনা থেকে মুক্ত থাকত। ৫৮০ হিজরীতে বাগদাদ ভ্রমণকারী প্রখ্যাত আরব পর্যটক ইবন জুবায়র আন্দালুসী (মৃ. ৬১৪ হিঃ) শায়খ রাদিয়্যুদ্দীন কাযবীনির ওয়াজ মাহফিলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “ওয়াজ চলাকালে মানুষের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। মানুষ পতঙ্গের মত পাগলের ন্যায় তওবাহ্‌র জন্য তাঁর হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং নিজেদের চুল ছিঁড়ছিল।”

হাফিজ ইবনে জওযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (মৃ. ৫৯৭ হি.)-এর ওয়াজ মাহফিলের অবস্থা ছিল এই, “মানুষ চিৎকার করে কাঁদত। মানুষ পাগল-প্রায় হয়ে যেত এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেত। আর লোকেরা তাদেরকে ধরে মাহফিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। নিজেদের কপালের চুল তাঁর হাতে ধরিয়ে দিত আর তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন।”[১]

হাফিজ ইবনে জওযী (র) স্বয়ং একবার তাঁর কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, এক লক্ষ মানুষ আমার হাতে তওবা করেছে।[২]

হি. ৫ম শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ ইসমাঈল লাহোরী সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

بزارہاسردم درمجلس وعظوم شرف باسلام شدئد -

“হাজার হাজার মানুষ তাঁর ওয়াজ-মাহফিলে ইসলাম কবুল করত।”[৩] ইবনে বতত্যু অনেক ভারতীয় ওয়ায়েজীনের ওয়াজের তাছীর সম্পর্কে এ ধরনের কাহিনী লিখেছেন।

কুফর ও ধর্মহীনতার আধিপত্য ও প্রাধান্যের যুগে প্রভাব সৃষ্টির এমন দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যেত। এ যুগে প্রভাবশালী থেকে প্রভাবশালী ধর্মীয় বাগ্মিতা ও নৈতিক উপদেশাবলী প্রভাবশূন্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণা সে সময় এরূপ মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল যা থেকে কোন কওম, ধর্ম কিংবা দল-উপদল মুক্ত ছিল না। ভাষা ও সাহিত্যে স্রষ্টার পরিচিতি, ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ওহী ও রিসালতের ভাষার শব্দসমষ্টি ও পরিভাষাসমূহ আত্মার ও রক্তের ন্যায় অব্যাহতভাবে এমনি প্রবাহিত ছিল যে, এই

১. রিহলা, ইবন জুবায়র কৃত, ৩০২পৃ.
২. সায়দুল খাতির ও লাফতাতুল-কাবাদ:
৩. তাযকিরা-ই-উলামা;

ভাষা ও সাহিত্যকে এর থেকে মুক্ত করা যেতে পারে না। ইসলামী টীকা-ব্যাখ্যা, ধর্মীয় শিষ্টাচার ও আদব অমুসলিমদের ভাষাসমূহের ওপর এভাবে জারি হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এই পরিমাণে এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, অন্য ভাষার বিকল্প শব্দ ব্যবহারে তাদের মন ভরত না। অমুসলিম সাহিত্যিক ও মনীষীরা অবাধে কুরআন মজীদ হিফ্জ করতেন। বিখ্যাত অমুসলিম সাহিত্যিক ও লেখক আবূ ইসহাক সাবী সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি রমযান মাসে রোযাও রাখতেন। আল্লাহ্কে পাবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক। হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলিম দেশসমূহের শহরগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের আগ্রহে এবং আল্লাহ্ওয়ালা মানুষের সন্ধানে মাঠ-ময়দান পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াত। যারা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতেন তাঁরা ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রত্যাবর্তনস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁদের আবাসগুলো আল্লাহ্সন্ধানী ও খোদাপ্রেমিক মানুষের ভিড়ে উপচে পড়ত। তাঁদের বসতবাড়ির জনসমাগম ও রওনক হুকুমতের প্রাণকেন্দ্র ও শাসকদের রাজধানীসমূহ থেকেও অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও মুখর ছিল। বড় পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রা)-এর মজলিস আব্বাসী খলীফাদের থেকেও অনেক বেশি জাঁকজমক ও রওনকপূর্ণ ছিল। আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও আল্লাহ-প্রাপ্তির আগ্রহ থেকে মুক্ত ছিল না। জীবনী গ্রন্থগুলো এ ধরনের উদাহরণে ভরপুর।

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমানদের পতন যুগ

পতন যুগের সূচনা ও এর কারণসমূহ

জনৈক লেখক কী সুন্দরই না বলেছেন, "মানুষের জীবনে এমন দুটো ব্যাপার আছে যার সঠিক মুহূর্তটি কেউ বলতে পারে না। এর একটার সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে আর তা হলো নিদ্রা। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক জাতীয় জীবনের সঙ্গে আর তা হলো তার অধঃপতন। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি যে, অমুক ব্যক্তিটি ঠিক কখন নিদ্রাচ্ছন্ন হলো বা ঘুমিয়ে পড়ল এবং অমুক জাতির পতন ঠিক কোন্ দিন্ বা কোন তারিখ থেকে শুরু হলো। মানুষ কেবল তখনই তা জানতে পারে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জাতি অসাড় হয়ে পড়ে।

অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য ও বাস্তব। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জীবনে পতনের সূচনা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান। আমরা যদি চরম উন্নতি ও পতনের মাঝের সীমাকে চিহ্নিত করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের আঙুল সেই ঐতিহাসিক রেখার ওপর রেখে দেব যেই রেখা খেলাফতে রাশেদা ও আরব রাজতন্ত্র বা মুসলমানদের বাদশাহীর মধ্যে বিভাজনকারী সীমা। সরাসরি ইসলামী নেতৃত্ব বা এর মাধ্যমে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর সেই সমস্ত ব্যক্তির হাতে ছিল যাঁদের প্রত্যেক সদস্য তাঁর ঈমান ও আকীদা, আমল ও আখলাক, প্রশিক্ষণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুকুমার বৃত্তি ও উন্নত চরিত্র বা ভারসাম্য রক্ষায় দিক থেকে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিওয়াসাল্লাম-এর একটি স্থায়ী মু'জিযা ছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে ইসলামের ছাঁচে এমনভাবে ঢেলেছিলেন যে, একমাত্র দেহ ছাড়া আর কোন কিছুতে আপন অতীতের সঙ্গে তাঁদের কোন সাদৃশ্য অবশিষ্ট ছিল না। না ঝোঁক ও প্রবণতার ক্ষেত্রে, না মন-মানসিকতার মধ্যে আর না চিন্তা-ভাবনার পন্থা ও পদ্ধতির মধ্যে, না প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে। এ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি যাঁদের কথা ওপরে বলা হয়েছে-দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ের পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। তাঁরা একাধারে সালাতের ইমাম, মসজিদের খতীব, কাযী ও বিচারক, বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারের আমানতদার ও বিশ্বস্ত ভাণ্ডাররক্ষক এবং সেনাবাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন এবং একই সময় তাঁরা যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমাধান, রাষ্ট্র ও শহর-নগরের ব্যবস্থাপনা এবং

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের মধ্যে একেকজন একই সময়ে মুত্তাকী সাধক, সিপাহী ও মুজাহিদ, সমঝদার কাযী, মুজতাহিদ ও ফকীহ, কুশলী ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ও নিপুণ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় একই সময় (খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে) ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁদের চারিপাশে সেই সমস্ত লোকের জামাআত ছিল যাঁরা সেই একই মাদরাসা-ই নববী কিংবা মসজিদে নববীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। একই ছাঁচে ঢালা, একই আত্মার ধারক-বাহক এবং একই স্বভাব-চরিত্র ও গুণে গুণান্বিত। খলীফা তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া করতেন না। অনন্তর তাঁদের প্রাণসত্তা সভ্যতা-সংস্কৃতির সমগ্র কাঠামোতে, হুকুমতের গোটা ব্যবস্থায় এবং মানুষের সমগ্র জীবন, সমাজ ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর তাঁদের ঝোঁক ও প্রবণতার ছায়াপাত ঘটে। তাতে তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে। সেখানে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত কিংবা সংঘর্ষ। সেখানে দীন ও দুনিয়ার কোন পার্থক্য বা বিভাজন ছিল না, ছিল না নীতি ও উপযোগিতার মধ্যে কোন প্রকার টানাপোড়েন। তেমনি উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যেও কোন বিশেষত্ব ছিল না। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী-সম্প্রদায় ও দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল না। মোটের ওপর তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামী সালতানাতের সমাজ জীবন এর প্রতিষ্ঠাতাদের নৈতিক চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ভারসাম্য ও সামগ্রিকতার পূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী দর্পণস্বরূপ ছিল।

জিহাদ ও ইজতিহাদের অভাব

আসল কথা হলো এই, ইসলামের ইমামত তথা নেতৃত্বের বিষয়টি বড়ই নাযুক ও স্পর্শকতার এবং তা ব্যাপক ও বিস্তৃত গুণাবলি দাবি করে। যেই ব্যক্তি বা দল এই আসনে বা পদে অধিষ্ঠিত হন তার জন্য ব্যক্তিগত উপদেশ-পরামর্শ, তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা ছাড়াও জিহাদ ও ইজতিহাদের যোগ্যতা আবশ্যক। এই শব্দ দু'টি খুবই সরল ও হালকা ধরনের হলেও এর অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জিহাদ বলতে বোঝায় : প্রিয়তম ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা কাম্য বস্তু হাসিলের উদ্দেশে নিজের চূড়ান্ত-শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ ব্যয় করা।

একজন মুসলমানের সব চাইতে বড় মকসূদ বা লক্ষ্য হলো আল্লাহর ফরমাবরদারী ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ও বিধি-বিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এজন্য প্রয়োজন এমন প্রতিটি আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ,

একজন মুসলমানের সব চাইতে বড় মকসূদ বা লক্ষ্য হলো আল্লাহর ফরমাবরদারী ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ও বিধি-বিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এজন্য প্রয়োজন এমন প্রতিটি আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, নৈতিক চরিত্র, ইচ্ছা-অভিসন্ধি ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে, দীর্ঘ জিহাদের যা এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জিহাদ ভেতর বাইরের ঐ সমস্ত উপাস্য ও মিথ্যা মা'বুদগুলোর বিরুদ্ধে যা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইসলামের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। এসব লক্ষ্য যখন অর্জিত হবে তখন একজন মুসলমানের জন্য জরুরী হলো, সে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধানসমূহকে তার চারপাশের পৃথিবী এবং তারই মত আর সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা-তদবীর করবে, প্রয়াস চালাবে। এটা তার ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহর সৃষ্টিকুলের কল্যাণ কামনার স্বাভাবিক চাহিদা। এটা এজন্যও জরুরী, কোন কোন সময় ব্যক্তিগত দীনদারী ও পরিবেশের আনুকূল্য ব্যতিরেকে কঠিন হয়ে পড়ে। কুরআন মজীদের পরিভাষায় একেই ফেতনা বলে। পৃথিবীতে যত জড়বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষ আছে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানসমূহের তথা তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক কানুনের সামনে মস্তকাবনত।

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

"আর আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الاَرضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে ? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি।" (সূরা হজ্জ : ১৮)

এ ব্যাপারে মানুষের কোন প্রকার চেষ্টা-তদবীরের ভূমিকা বা কোন প্রকারের চেষ্টা-সাধনার আবশ্যকতা নেই। প্রাণীকুলের জন্য জীবন-মৃত্যু ও লালন-পালনের যেই আইন-কানুন রয়েছে এবং তার শরীর ও প্রকৃতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর ওপর তারা বিনা প্রশ্নে অবনত

বিনা প্রশ্নে অবনত মস্তকে চলছে এবং চলতে থাকবে। এর থেকে চুল পরিমাণও ব্যত্যয় ঘটবে না। যেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নিমিত্ত মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত তা হলো আল্লাহর এই কানুন তথা বিধানের বাস্তবায়ন ও এর প্রয়োগ যা আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম নিয়ে এসেছেন এবং যার বিজয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের অনুসারীরা আদিষ্ট। এর বিরোধী শক্তি ও আহ্বান দুনিয়ার বুকে হামেশা থাকবে। এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর অনেক প্রকার ও রূপ রয়েছে যুদ্ধও যার অন্যতম যা কোন কোন সময় এর সর্বোত্তম প্রকারে পরিণত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইসলামের সমান্তরালে কোন প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেন অবশিষ্ট না থাকে যারা মানব প্রকৃতিকে বিরোধী দিকের পানে টানবে এবং অসংখ্য মানুষের জন্য কুফর ও ইসলামের মাঝে সংঘাত হিসেবে দেখা দেবে।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ - وَيَكُوْنُ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবৎ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা বাকারা: ১৯৩)

এই জিহাদের একটি দাবি এও যে, মানুষ সেই ইসলাম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল হবে যার খাতিরে তারা জিহাদ করবে এবং কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কেও অবহিত থাকবে যার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছে। তারা গভীরভাবে অবহিত হবে যাতে করে যেই পোশাকে ও যেই রঙেই তা জাহির হোক, দেখামাত্রই তা চিনবে। হযরত ওমর (রা)-এর একটি উক্তি হলো : আমার ভয় হয় যে, সেসব লোক ইসলামের শেকলের কড়াগুলো ছড়িয়ে দেবে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দেবে, যারা ইসলামের ভেতর লালিত-পালিত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে, অথচ জাহিলিয়াতকে তার চেনে না। একথা নিশ্চিত যে, সকল মুসলমানের জন্য এটা জরুরী নয় যে, তারা কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিতভাবে অবহিত হবে এবং এর বিকাশ, অবয়ব ও রঙ-রূপ সম্পর্কে জানবে এবং চিনবে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ, ইসলামের যারা দিক-নির্দেশনা দেবেন এবং কুফর ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের জন্য এটা জরুরী যে, তাঁরা সাধারণ ও মধ্যম শ্রেণীর মুসলমানদের তুলনায় কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কে অধিক অবগত হবেন।

তেমনি এটাও জরুরী যে, যে সমস্ত লোক এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন তাঁদের প্রস্তুতি পূর্ণ এবং শক্তি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হবে। তাঁদের কাছে লোহা কাটবার জন্য লোহা, বরং ততোধিক শক্ত ইস্পাত থাকবে। কুফরের মুকাবিলা করবে সে সমস্ত উপায়-উপকরণ ও আসবাব দিয়ে যা তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে যেগুলো মানুষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং যতদূর সম্ভব মানুষের জ্ঞানায়ত্ত।

যেগুলো মানুষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং যতদূর সম্ভব মানুষের জ্ঞানায়ত্ত। এজন্য আল্লাহ্র নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ - اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ -

"তোমাদের তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না" (সূরা আনফাল : ৬০)।

ইজতিহাদ দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই, মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব (ইমামত) যে সমস্ত লোকের হাতে থাকবে যারা সামনে আসা জীবনের নতুন নতুন সমস্যা-সংকটকে এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে সঠিক ও যথাযথ ফয়সালা করবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখেন এবং ইসলামের স্পিরিট ও ইসলামের আইন প্রণয়নের মৌল নীতিমালা সম্পর্কে এতটা অবহিত এবং মসলা বের করবার ব্যাপারে এতটা পারঙ্গম হবেন যে, তাঁরা মুসলিম উম্মাহর সামনে বিরাজমান সংকটগুলোর সমাধান করতে পারেন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বকালে ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যিনি তাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। অধিকন্তু তারা এতটা মেধা, কর্মক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী ও পরিশ্রমী হবেন যাতে আল্লাহ্তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতে ও যমীনের বুকে যেই প্রাকৃতিক শক্তি, সম্পদ ও শক্তির উৎস রেখে দিয়েছেন তা থেকে তাঁরা কাজ নিতে পারেন এবং সেগুলোকে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক বানাতে পারেন। বাতিলপন্থীরা সেগুলোকে তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে ব্যবহার করবে এবং যমীনে ফেতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির কাজে এ সবের সাহায্য নেবে। পক্ষান্তরে সত্য পথের পথিক এসব থেকে কাজ নেবে যেজন্য আল্লাহ্ তাআলা এসব পয়দা করেছেন।

উমায়্যা ও আব্বাসী খলীফাবৃন্দ

কিন্তু দুর্ভাগ্য দুনিয়াবাসীর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর পৃথিবীর নেতৃত্বের মর্যাদামণ্ডিত আসনে এমন সব লোক জেঁকে বসে যারা এজন্য কোন প্রকৃত প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় ও স্বয়ং আপন যুগের অনেক

মুসলমানের মত তারা উচ্চতর ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেনি। তাদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের মান এতটা সমুন্নত ছিল না যা মুসলিম মিল্লাতের একজন নেতার মর্যাদার উপযোগী। তাদের মস্তিষ্ক ও স্বভাব-প্রকৃতি আরবের প্রাচীন প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি। তাদের মধ্যে না জিহাদের রূহ ছিল আর না ছিল ইজতিহাদের শক্তি যা দুনিয়ার ইমামত ও বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। খলীফা-ই রাশেদ হযরত ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (মৃ. ১৭১ হি.) ব্যতীত উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের সকলের অবস্থা ছিল এরূপই।

রাজতন্ত্রের প্রভাব ও পরিণতি

এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের লৌহ প্রাকারে অনেক ফাঁক-ফোকর দেখা দেয়। ফলে উপর্যুপরি নানাবিধ ফেতনা ও মুসীবত দেখা দেয়। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল ঃ

ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন

ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কার্যত বিভাজন দেখা দেয়। কেননা পরবর্তী শাসকগণ জ্ঞানে, গরিমায় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এতটুকু যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না যে, তাদের উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। তাঁরা হুকুমত ও রাষ্ট্রনীতিকেই নিজেদের হাতে রাখেন এবং যখন তাঁরা চেয়েছেন কিংবা যখন পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা ও দাবি দেখা দিয়েছে কেবল তখনই পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে তারা উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকদের সাহায্য নিয়েছেন ও যতটুকু তারা চেয়েছেন কবুল করেছেন এবং যখন চেয়েছেন তাদের পরামর্শ পাশে রেখে দিয়েছেন, সে মতে আমল করেন নি। এভাবে রাষ্ট্রনীতি ধর্মের খবরদারী ও তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে শেকলবিহীন হাতির ন্যায় লাগামহীন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে দীনদার ও উলামা শ্রেণী হয় হুকুমতের বিরোধী হয়ে গেছেন কিংবা মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। আবার কেউ কেউ রাষ্ট্র ও রাজনীতির ময়দান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন এবং তাৎক্ষণিক বিপ্লব সম্পর্কে হতাশ হয়ে চতুষ্পার্শের ঘটনাবলী থেকে চোখ বন্ধ করে ব্যক্তির সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কেউ কেউ নিজের পরিবেশের খারাবী দৃষ্টে আর্তনাদ করতেন, আর্তস্বরে চিৎকার করতেন এবং এসবের ওপর ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র সমালোচনা করতেন। কিন্তু কী করবেন? তাঁরা ছিলেন অসহায় , মজবুর। তাঁদের কিছু করার উপায় ছিল না। আবার কেউ কেউ

কোন ধর্মীয় মুসলিহাতের খাতিরে বা ব্যক্তিস্বার্থে হুকুমতের সাথে সহযোগিতা করতেন এবং তাদের ব্যবস্থায় শরীক থেকে যতটুকু সম্ভব ইসলাহ ও সংশোধনের প্রয়াস পেতেন। সে যা-ই হোক, এভাবে কার্যত ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি আলাদা হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদার আগে দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনার যে অবস্থা ছিল তারই একটি রঙ পয়দা হয়ে গেল। ধর্ম দিন দিন শক্তিহীন, প্রভাবশূন্য ও নিষ্প্রভ হয়ে চলল আর ওদিকে রাষ্ট্রনীতি হাত-পা মেলতে শুরু করল। ধর্মের লাগাম শিথিল এবং রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণহীন ও তার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। সেইদিন থেকেই উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোক এবং দুনিয়াদার ও জাগতিক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরিষ্কার দুটো পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হলো এবং এ দু'য়ের মাঝে ফাঁক দিন দিন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকল এবং কোন কোন সময় তা বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হতো।

রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যে জাহিলিয়তের প্রবণতা সৃষ্টি

হুকুমতের সদস্যবৃন্দ, এমন কি স্বয়ং খলীফা নিজেও ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ নমুনা ছিলেন না। এমন কি তাদের কারোর কারোর মধ্যে জাহিলী যুগের রোগ-জীবাণু ও প্রবণতা পাওয়া যেত। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও মন-মানসিকতার প্রভাব জাতীয় জীবনের ওপর পড়ত এবং লোকে সাধারণত তাদেরই আচার-আচরণ ও প্রবণতার অন্ধ অনুকরণ করত। ধর্মের খবরদারি ও দেখাশোনা খতম হয়ে গিয়েছিল। তাদের জবাবদিহিতা উঠে গিয়েছিল। আমরু বিল-মা'রুফ ওয়া নাহী আনিল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের প্রাধান্য খতম হয়ে গিয়েছিল। কেননা এর পেছনে কোন শক্তি কিংবা রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এ ছিল কেবল হাতে গোণা এমন কতিপয় লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আমল যাদের কাছে কোন শক্তি এবং অমান্য ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কাউকে শাস্তি দানের কোন অধিকার ছিল না, অথচ এর বিপরীতে লাগামহীন ও মুক্ত জীবনের লোভনীয় হাতছানি ছিল অনেক। ফলে মুসলিম জনপদগুলোর ভেতর জাহিলিয়াত শ্বাস গ্রহণের অবাধ সুযোগ পায় এবং ক্রমান্বয়ে তা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সমৃদ্ধি কামনা ও আনন্দ উপভোগের জীবন ব্যাপক হয়ে যায়। খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের বাজার হয়ে যায় গরম ও রমরমা। বিলাসব্যসন ও প্রবৃত্তিপূজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভোগ-লিপ্সা বৃদ্ধি পায়। এই নৈতিক অধঃপতন ও ভোগবিলাসে মত্ত কোন জাতির পক্ষে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন, 'আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাতু ওয়াস-সালামের প্রতিনিধিত্ব করা, আল্লাহ তা'আলা ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকা, তাকওয়া ও দীনদারীকে

উৎসাহিত করা এবং লোকের জন্য উন্নততর চারিত্রিক নমুনা কায়েম করা সম্ভব নয়, বরং এসব অবস্থায় জাতি তার নিজের অস্তিত্ব, সম্মান ও আযাদী বজায় রাখার শক্তিও খুইয়ে বসে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً ـ

"পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। তুমি কখনও আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।" (সূরা আহযাব ঃ৬২)

ইসলামের অপপ্রতিনিধিত্ব

অল্প দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই সব লোক নিজেদের আমল-আখলাক ও পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ইসলামের শরঈ রাষ্ট্রনীতি, এর সামরিক আইন-কানুন, এর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও এর নৈতিক শিক্ষামালার খুব কমই প্রতিনিধিত্ব করত। এভাবে অমুসলিমদের দিল থেকে ইসলামের পয়গামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তার প্রভাব চলে যেতে লাগল এবং ওদের প্রতি তাদের আস্থায় ভাটা পড়ল। জনৈক য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকের ভাষায়: That the decline of Islam began when people stared to lose faith in the sincerity of its representatives. অর্থাৎ ইসলামের পতন সেদিন থেকে শুরু হলো যেদিন মানুষ ঐ সমস্ত লোকের সততার ব্যাপারে, তাদের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে লাগল যারা নতুন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

দার্শনিক জটিলতা নিয়ে মেতে থাকা

সেই পতন যুগে মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তানায়কগণ যেই পরিমাণ অধিবিদ্যা (Metaphysics) ও গ্রীকদের ধর্মতত্ত্বের (Theology) দিকে মনোযোগ দেন সেই পরিমাণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) কার্যকর ফলপ্রসু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে দিকে নজর দেননি, অথচ এই গ্রীক দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব গ্রীকদের দেবমালা বা প্রতিমাবিদ্যা (Mythology) বৈ কিছুই ছিল না যাকে তারা নিজেদের চাতুর্যরূপে দার্শনিকসুলভ শব্দসমষ্টি ও পরিভাষার আড়ালে একটি যুক্তিশাস্ত্রের পোশাকে পেশ করেছিল। তা ছিল স্রেফ কতিপয় অলীক কল্পনার সমষ্টি ও শব্দসমষ্টির এমন এক ইন্দ্রজাল যার পেছনে কোন বাস্তবতা ও মৌলিকত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও করুণায় মুসলমানদেরকে এই অহেতুক ও অর্থহীন বিষয় থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবুওতের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সেই নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞান দান করেছিলেন যার বর্তমানে সেই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত সম্পর্কে সেই রাসায়নিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের (যা ঐশী দর্শন ও বাণীর

পদ্ধতি) আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদগণ এই মহানেয়ামতের কদর না করে সেই সব আলোচনা সমালোচনার অর্থহীন কাজে, দুনিয়া ও আখিরাতে যেগুলোর কোনই লাভ নেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতা ও মেধার অপচয় করেন। এই মগ্নতা তাদেরকে সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ দেয়নি যা তাদের জন্য বিশ্বজগতের সমূহ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত ও অধীনস্থ করে দিত এবং এরপর সে এসব শক্তিকে ইসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর উপাদানের অনুগত ও সেবক বানিয়ে ইসলামের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক একচ্ছত্র শাসনকে তামাম পৃথিবীর ওপর কায়েম করে দিতে সমর্থ হতো। ঠিক তেমনি তারা নিউ প্লেটোনিক দর্শন তথা অধিবিদ্যার আলোচনা-সমালোচনা ও ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদ নিয়েও প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করে।

শির্‌ক ও বিদ'আত

এই পতন যুগে মুসলমানদের মধ্যে শির্‌ক ও মূর্খতা, প্রাচীন সব জাহিল জাতিগোষ্ঠীর আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং মুসলিম জীবনে ও তাদের মেযাজে এমন সব বিদ'আত স্থান করে নেয় যেগুলো ধর্মীয় জীবনের একটি বিরাট স্থান দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ দীন ও দুনিয়ার সাফল্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানদের যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা এই দীনের বদৌলতেই, এই ইসলামের কারণেই যা আল্লাহ্‌র রসূল (সা) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط

"এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম"[ফুস্‌সিলাতঃ ৪২ সূরা নামল : ৮৮] " تنزيل من حكيم حميد এটা প্রজ্ঞাময় ও স্ব-মহিমায় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। অনন্তর যখন এর মধ্যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, স্বকপোল-কল্পিত আমল ও রসমের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং আল্লাহ্ না করুন, তা তার মৌলিকত্ব খুইয়ে বসবে তখন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের গ্যারান্টি আর অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে এই যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তার সামনে মাথা নত করবে এবং মানুষের দিল্ সে জয় করবে।

দাওয়াত ও তাজদীদের অব্যাহত ধারা

প্রকাশ থাকে যে, আসল দীন কিন্তু এই গোটা মুদ্দতে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে নিরাপদই থাকে। মুসলমানরা সঠিক রাস্তা থেকে যেখানে যেখানে সরে এসেছিল কিংবা বিপথগামী হয়েছিল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই ধরা পড়ত। দীন ও শরীয়ত মুসলমানদের ভুলের ক্ষেত্রে কখনো সঙ্গ দেয়নি, বরং এসবের অধ্যয়ন থেকে গায়ের ইসলামী তথা অনৈসলামী পরিবেশ, শিরকমূলক ও বিদআতসর্বস্ব কার্যকলাপ, রসম, জাহিলী আমল-আখলাক ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে, অধিকন্তু আমীর-উমারা শ্রেণী ও রাজা-বাদশাহ্‌দের ভোগ-বিলাস ও জোর-যবরদস্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি হতো। এরই ফলে ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে এমন সব উন্নত মনোবলসম্পন্ন ও অটুট ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষ জন্ম নিতে থাকেন, যাঁরা এই উম্মাহ্‌র মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন, মুসলমানদের মুর্দা দেহে জিহাদী রূহের সঞ্চার করেছেন, বছরের পর বছর ধরে জড় ও নির্জীব সমতলে গতি ও তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, মাসলা-মাসাইল ও বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তা-চেতনা জীবন্ত করেছেন এবং মুজতাহিদসুলভ যোগ্যতা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নবতর ইসলামী রূহ ও মানসিক জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। পর্যবেক্ষণসুলভ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন ঐতিহাসিকের চোখে জিহাদ ও তাজদীদের ইতিহাসে কোন শূন্যতা ও বিরতি দৃষ্টি গোচর হয় না। সংস্কারের জ্বলন্ত মশাল ও প্রদীপ অব্যাহত পন্থায় একের থেকে অন্যে আলো জ্বেলে দিয়েছে এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ও সে আলো নিভিয়ে দিতে পারেনি।[১]

এরই সাথে সাথে যখন ইসলাম কিংবা মুসলিম বিশ্বের সামনে নতুন কোন বিপদ এসে দেখা দিয়েছে, তখন কোন মর্দে মুজাহিদ ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং কেবল সেই বিপদকে দূর করেছেন তাই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বে এক নতুন রূহ্ ও নতুন জীবন সঞ্চার করেছেন। সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এর উজ্জ্বলতর উদাহরণ।

ক্রুসেড ও যঙ্গী খান্দান

খ্রিস্টান য়ূরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। মুসলমানরা তার গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ওপর দখল জমিয়ে রেখেছিল এবং

১. দ্র. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭;

তাদের সমস্ত পবিত্র স্থানই মুসলমানদের দখলে ছিল। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর ওপর তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের দরুন তাদের আক্রমণ পরিচালনার সাহস হতো না। হি. ৫ম/খ্রি. ১১শ শতাব্দীর শেষে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, য়ূরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাদের সেনাবাহিনী বন্যা ও তুফানের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ৪৯২হি./১০৯৯ খ্রি. সনে ক্রুসেডাররা জেরুসালেম (বায়তুল মাকদিস) জয় করে নেয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের এক বিরাট অংশই তাদের দখলে চলে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টানলি লেনপুল বলেন:

"The crusaders penetrated like a wedge between the old wood and the new and for a while seemed to cleave the trunk of Mohamadan Empire into splinters."

"ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন পুরনো কাষ্ঠখণ্ডের ভেতর খুব সহজে পেরেক ঢুকানো হয়। স্বল্প সময়ের জন্য এরূপ মনে হচ্ছিল যে, তারা ইসলামরূপী বৃক্ষের মূল কাণ্ড উপড়ে ফেলে তা ধুনিত তুলোর মত উড়িয়ে দেবে।"[১]

ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ একজন দায়িত্বশীল খ্রিস্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন ঃ

"So terrible, it is said, was the carnage which followed that the horses of the Crusaders who rode up to the mosque of Omar were knee-deep in the stream of blood. Infants were seized by their feet and dashed against the walls or whirled over the battlements, while the Jews were all burnt alive in their synagogue."

"বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যে সব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে ওমর (রা)-এ গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে ঠ্যাং ধরে দেওয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে ইয়াহূদীদেরকে তাদের সিনাগগের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।"[২]

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২১৪ পৃ.(উর্দু সংস্করণ ১৮৯ পৃ

২. .আবুল ফিদা হামাবীর ইতিহাস; ।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিস্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সংকেত। খ্রিস্টানদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এরপর থেকে এতখানি বেড়ে যায় যে, কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মুআজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে বেশি নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি।

ঠিক এমনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বর্ধিত হতাশার মাঝে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। যেখানে আদৌ আশার ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, সেখান থেকে এমন এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয় যার কল্পনাও কারও মনে ঠাঁই পায়নি। আর সেটা ছিল মাওসিলের যঙ্গী খান্দানের দু'জন সদস্য ইমাদুদ্দীন যঙ্গী (মৃ. ৫৪১ হি.) এবং তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন যঙ্গী (মৃ ৫৬৯ হি.)। তাঁরা ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজয় বরণে বাধ্য করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতিরেকে (যার বিজয় সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল) ফিলিস্তীনের প্রায় গোটাটাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। নূরুদ্দীন যঙ্গী তাঁর আত্মিক সৌজন্য, যুহ্‌দ ও আল্লাহ্-ভীতি, উত্তম ব্যবস্থাপনা, ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, বিনয় ও নম্রতা, জিহাদী প্রেরণা এবং ঈমান ও ইয়াকীনের দিক দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল-আছীর জাযারী তদীয় 'তারীখুল কামিল' নামক গ্রন্থে বলেনঃ আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছি। খুলাফায়ে রাশেদীন ও ওমর ইবনু'ল আবদুল আযীযের পর নূরুদ্দীনের চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং তাঁর চেয়ে অধিক ন্যায় বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি।[১]

সালাহুদ্দীনের নেতৃত্ব

নূরুদ্দীনের পর তাঁরই হাতে গড়া ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান সালাহুদ্দীন খ্রিস্টান জগতের মুকাবিলায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে বিভিন্ন যুদ্ধের পর তিনি হিত্তীন (ফিলিস্তীন) প্রান্তরে ১৪ই রবিউল আউয়াল, ৫৮৩ হি./৪ঠা জুলাই ১১৮৭ খ্রি. ক্রুসেডারদের এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দেয়। লেনপুল নিম্নোক্ত ভাষায় এর ছবি এঁকেছেন:

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২০৫।

"A Single saracen was seen dragging some thirty Christians he had taken prisoners and tied together with ropes. The dead lay in heaps, like stones upon stones, whilst mutilated heads strewed the ground like a plentiful crop of melons,"

"এক একজন মুসলিম সৈনিক তিরিশ জনের মত খ্রিস্টান সৈন্যের প্লাটুন, যাদেরকে সে স্বহস্তে বন্দী করেছিল, তাঁবুর দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। নিহত ক্রুসেডারদের লাশ ও তাদের কর্তিত হাত-পা এমনভাবে স্তূপাকারে পড়েছিল যেমনভাবে পাথরের পর পাথর স্তূপাকারে পড়ে থাকে। কর্তিত ও খণ্ড-বিখণ্ড লাশ এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়ে ছিল যেরূপ তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে।"[১]

যুদ্ধের এই রক্তাক্ত ময়দানে তিরিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বলে দীর্ঘদিন যাবত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

হিত্তীন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সুলতান সালাহুদ্দীন ২৭শে রজব তারিখে হি. ৫৮৩/১১৮৭ খ্রি. বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন যা সুদীর্ঘ ৯০ বছর যাবত মুসলমানদের হৃদয়-মনকে অস্থির করে রেখেছিল। সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাথী কাযী বাহাউদ্দীন ইবন শাদ্দাদ বলেন :

"এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এই পবিত্র মুহূর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসে আলিম-উলামা, কামিল-ফাযিল ও মুসাফির-পর্যটকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটে। লোকেরা যখন জানতে পারল যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাসমূহ মুসলমানরা জয় করে ফেলেছে, তখন মিসর ও সিরিয়া থেকে উলামায়ে কিরাম দলে দলে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হন। চতুর্দিকে দো'আ ও তকবীর-তাহলীল ধ্বনিত হচ্ছিল। ৯০ বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাসে জুমুআর সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং কুব্বাতু'স-সাখরার ওপর যেই ক্রস-কাষ্ঠ স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলা হয়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌র সাহায্য খোলা চোখে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।"[২]

সুলতান সালাহুদ্দীন প্রদর্শিত এ সময়কার সদাশয়তা, উদারতা, মহত্ত্ব ও ইসলামী আখলাক-চরিত্রের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন :

"If the taking of Jerusalem were the only fact known about Saladin, it were enough to prove him the most chivalrous and great-hearted conqueror of his own and perhaps of any age."

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২১৪ পৃ.; উর্দু সংস্করণ ১৮৯ পৃ.।
২. আবুল ফিদা হামাবীর ইতিহাস।

"সুলতান সালাহুদ্দীনের সমস্ত গুণের ভেতর কেবল এই একটি গুণের কথা যদি দুনিয়া জানত, যদি জানতে পারত তিনি কীভাবে জেরুসালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, সুলতান সালাহুদ্দীন কেবল তাঁর যুগের নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন প্রতীক ছিলেন।"[১]

মুসলমানদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং হিত্তীন রণক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের অবমাননাকর পরাজয়ে গোটা যূরোপে পুনরায় ক্রোধ ও জিঘাংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সমগ্র যূরোপ সিরিয়া (শাম)-এর মত ছোট্ট দেশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের সকলের মুকাবিলায় ছিলেন একাকী সুলতান সালাহুদ্দীন, তাঁর আত্মীয়-বান্ধব ও কতিপয় মিত্র যাঁরা গোটা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে খ্রিস্টান শক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন।

অবশেষে পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে রমলা নামক স্থানে ক্লান্ত ও অবসন্ন উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসসহ মুসলমানদের বিজিত শহর ও দুর্গগুলো আগের মতই মুসলমানদের হাতে থাকে।

সমুদ্রোপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য একরের নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে ছিল। বাদ বাকি গোটা দেশই ছিল সুলতান সালাহুদ্দীনের অধিকারে। সুলতান সালাহুদ্দীন যে দায়িত্ব ও খেদমত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে কি, আল্লাহ তা'আলা যে কর্মভার তাঁর কাঁধে ন্যস্ত করেছিলেন তাঁর হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। লেনপুল বলেন:

The Holy War was over; the five years' contest ended. Before the great victory at Hittin in July, 1187. not an inch of Palestine west of the Jordan was in the Muslim's hands. After the peace of Ramla in September, 1192, the whole land was theirs except an arrow strip of coast from Tyre to Jaffa. Saladin had no cause to be ashamed of the treaty.

"পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তারক্তির পর অবশেষে পবিত্র যুদ্ধ (?) শেষ হলো। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হিত্তীনে মুসলমানদের বিজয়ের আগে জর্দান নদীর পশ্চিমে তাদের অধিকারে এক ইঞ্চি জায়গাও ছিল না। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যখন রমলার সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সূর থেকে শুরু করে য়াফা পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এলাকায় এক চিলতে ভূখণ্ড ছাড়া গোটা দেশটাই

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ২৩৪ পৃ.।

মুসলমানদের অধিকারে চলে গেল। এই সন্ধি স্থাপনের দরুন সালাহুদ্দীনের এতটুকু লজ্জিত হবার প্রয়োজন ছিল না।"[১]

সুলতান সালাহুদ্দীন সর্বোত্তম সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল সিপাহসালার ও বিজেতাই ছিলেন না, বরং জনপ্রিয় নেতা ও সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য সিপাহীও ছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত ইসলামী রাজ্য ও শক্তি এবং নানাভাবে বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও গোত্রগুলোকে তিনি জিহাদের পতাকাতলে সমবেত করেন। সুদীর্ঘকাল পর তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্ব একটি সুসংগঠিত ও সুশৃংখল আন্তরিকতাপূর্ণ যুদ্ধ করে যার লক্ষ্য ইসলামের হেফাজত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু ছিল না। লেনপুল যথাযথ লিখেছেন:

"All the strength of Christendom concentrated in the third Crusade had not shaken Saladin's power. His soldiers may have murmured at their long months of hard and perilous service year after year, but they never refused to come to his summons and lay down their lives in his cause............"

"তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে সমগ্র খ্রিস্টান জগতের মিলিত শক্তি মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সালাহুদ্দীনের শক্তিতে তারা এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। সালাহুদ্দীনের সৈন্যরা মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রম এবং বছরের পর বছর বিপদসঙ্কুল খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়েছিল বটে, কিন্তু তাদের মুখে অভিযোগের লেশমাত্র ছিল না। তলব মাত্রই হাজির হতে এবং একটি নেক কাজে নিজেদের জীবন কুরবানী দিতে তাদের কেউ পিছপা হয়নি।"[২]

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন:

Kurds, Turkmans, Arabs and Egyptians, they were all Moslem's and his servants when he called. In spite of their differences of race, their national jealousies and tribal pride, he had kept them together as one host-not without difficulty and, twice or thrice, a critical waver.

"কুর্দ, তুর্কমেন, আরব, মিসরীয় সমস্ত মুসলমানই ছিল সুলতানের খাদেম। তলব মাত্রই তারা খাদেমের মতই সুলতানের খেদমতে এসে হাজির হতো। কে কোন্ বংশের কিংবা কে কোন্ জাতিগোষ্ঠীর সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। বর্ণ, বংশ, গোত্রগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুলতান তাদেরকে এমন একটি অখণ্ড ও

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৩৫৮, পৃ.।
২. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৩৫৮, পৃ.।

ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, গোটা বাহিনী যেন এক আত্মায় লীন হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো সবাই যেন একই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য!"[১]

সালাহুদ্দীনের পরে

৫৮৯ হিজরীর ২৭শে সফর / ৪ঠা মার্চ, ১১৯৩ খ্রি. তারিখে ইসলামের এই বিশ্বস্ত সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সালাহুদ্দীনের জিহাদী প্রয়াস ও তাঁর সময়োপযোগী নেতৃত্ব মুসলিম জাহানকে ক্রুসেডারদের গোলামির ভয়াবহ বিপদ থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য নিরাপদ করে দেয়। মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা কিন্তু এসব যুদ্ধ থেকে ঠিকই ফায়দা লোটে। তারা নিজেদের ও মুসলিম জাহানের দুর্বলতাগুলো অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার নিরিখে পর্যালোচনা করার পর নতুন ক্রুসেড যুদ্ধের (যার পরিণতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা দেয়) প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম জাহানের ওপর পুনরায় আলস্য ও গাফিলতির ভূত চেপে বসে। পারস্পরিক অনৈক্য ও হানাহানি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সালাহুদ্দীনের পর মুসলিম জাহান পুনরায় এরকম অকৃত্রিম নেতা ও পথ-প্রদর্শক পায়নি, যিনি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতের জন্য অস্থির হয়েছেন, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু নয় এবং যিনি মুসলিম জাহানের এতটা আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন আর মুসলিম বিশ্বের নাড়ির সঙ্গে যিনি এতটা সম্পর্কিত ছিলেন যতটা ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন। ফলে মুসলিম জাহান আরেকবার স্বার্থপরতা, গৃহযুদ্ধ ও চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পতন ও দুর্যোগের ঘনঘটায় ছেয়ে যায়।

জাহিলিয়াতের জন্য প্রতিবন্ধকতা

কিন্তু মুসলমান তার যাবতীয় খারাবী ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নিজেদের সর্বপ্রকার স্খলন সত্ত্বেও সমকালীন সমস্ত জাহেলী জাতিগোষ্ঠীর মুকাবিলায় আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম প্রদর্শিত রাজপথের কাছাকাছি অবস্থান করছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র অধিক অনুগত ও বাধ্য ছিল। তাদের অস্তিত্ব ও তাদের ছিটেফোঁটা ক্ষমতা জাহিলিয়াতের বিস্তার ও উন্নতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ও লৌহ প্রাকার প্রমাণিত হচ্ছিল। তারা নিজেদের যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও দুনিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল যাদেরকে অপরাপর রাজশক্তি ভয় পেত এবং সদা সন্ত্রস্ত থাকত। তাদের দৃষ্টিতেও মুসলমানরা বিরাট গুরুত্বের অধিকারী ছিল। বাহ্যিক অবয়বে ধরা না পড়লেও এবং বাইরের হুকুমতগুলোর কাছে তা অনুভূত

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৩১০-১১, পৃ.।

না হলেও ভেতর থেকে এই শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছিল, এমন কি হি. ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও নৈতিক দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং মুসলিম শক্তির সেই ভীতিকর ছায়া যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো-দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হয়ে যায়। সাথে সাথে মুসলমানদের ওপর বর্বর ও অসভ্য জাতিগোষ্ঠী ও প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম দেশগুলো লাওয়ারিশ মালের মত বিজয়ী শক্তিগুলোর হাতে ভাগ-বণ্টিত হতে থাকে।

তাতারী ফেৎনা

এ সব বন্য ও বর্বর আক্রমণের মধ্যে সব চাইতে বড় আক্রমণ ছিল তাতারীদের আক্রমণ যা পিপীলিকা ও পতঙ্গের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয় এবং সমগ্র মুসলিম জাহান ছেয়ে ফেলে। তাতারী আক্রমণ মুসলিম জাহানের জন্য ছিল এক মহা দুর্যোগ যার ফলে মুসলিম বিশ্বের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। মুসলমানরা ছিল হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক ধরনের ত্রাস ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। একবার তো প্রায় গোটা মুসলিম জাহানই (বিশেষ করে এর প্রাচ্য ভূখণ্ড) এই মর্মবিদারক ফেতনার আওতায় চলে এসেছিল। ঐতিহাসিক ইব্‌ন আছীরও এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর মনের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন :

"এই দুর্যোগ ও দুর্বিপাক এতই ভয়াবহ ও অসহনীয় ছিল যে, কয়েক বছর যাবত আমি দো-টানার মধ্যে ছিলাম-এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব কি না। এখনও যে করছি তাও বিরাট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে করছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যু খবর শোনানো কার পক্ষেই বা সহজ আর এতখানি বুকের পাটাই বা কার আছে যে, তাদের যিল্লতি ও লাঞ্ছনার কাহিনী শোনাবে? হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম। হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম, হারিয়ে যেতাম বিস্মৃতির অতলে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার কতক দোস্ত আমাকে এ ঘটনা লিখতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এরপরও আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম এটা না লেখার মধ্যেও কোন ফায়দা নেই।

"এ এমনই এক দুর্ঘটনা এবং এমনই এক মুসীবত যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এ ঘটনার সম্পর্ক গোটা মানব সমাজের সঙ্গে। যদি কেউ দাবি করে যে, আদম (আ)-এর পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটিও ঘটেনি তবে তা ভুল হবে না। আর তা

এজন্য যে, ইতিহাসে এর সমপাল্লার কোন ঘটনার সন্ধানই পাওয়া যায় না। দুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত (ইয়াজূজ-মা'জূজ ভিন্ন) কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে। ঐ সব বর্বর পশু কারোর প্রতি এতটুকু কৃপা দেখায় নি। তারা নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে, মহিলাদের পেট চিরেছে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি'ল-আলিয়্যি'ল আজীম। এ দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্বগ্রাসী। মহাপ্লাবন আকারে এটা দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা পৃথিবীটাই যেন ছেয়ে ফেলে!"[১]

৬৫৬ হিজরীতে এই বন্য ও বর্বর তাতারীরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে এবং এর অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ঐতিহাসিক ইবন কাছীর বাগদাদের ধ্বংস ও তাতারীদের ব্যাপক গণ হত্যা ও হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে বলেনঃ

"চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। চল্লিশ দিন পর তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এই শহরটি এমনভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় যে, মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ। লাশের এক একটি স্তূপ ছোটখাটো একটি টিলার মত মনে হচ্ছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা ফুলে আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। গোটা শহর ভর্তি গলিত লাশের গন্ধে এলাকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। দূষিত আবহাওয়া ও মহামারীর কারণে আরও বহু লোক মারা যায়। বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস–এই তিনের রাজত্ব চলছিল।"[২]

মিসরীয় সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় তাতারীদের পরাজয়

ইরাক ও সিরিয়া দখলের পর তাতারীদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই মিসরের দিকে ছিল। আর মিসরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিসরের সুলতান আল-মালিকুল মুজাফফার সায়ফুদ্দীন কুতুয পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, এবার নির্ঘাত মিসরের পালা। তাতারীরা যদি আগেভাগেই তার ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। অতএব, মিসরের অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শামে তাতারীদের ওপর হামলা পরিচালনা করাটাকেই তিনি সমীচীন মনে করলেন। অনন্তর ৬৫৮ হিজরীর পবিত্র মাহে রমযানের ২৫ তারিখে আয়ন-ই জালূত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে মিসরের মুসলিম ফৌজের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীত এ যুদ্ধে তাতারীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং

তারা পালাতে থাকে। মিসরীয় ফৌজ পলায়নরত তাতারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ব্যাপক হারে তাদের কচুকাটা করে। বিপুল সংখ্যক তাতারী মুসলমানদের হাতে বন্দীও হয়।

সায়ফুদ্দীন কুতুয-এর পর আল-মালিকুজ-জাহির বায়বার্স কয়েকবার তাতারীদের উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া এলাকা থেকে তাদেরকে উৎখাত ও বহিষ্কৃত করেন। এভাবে "তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব" এই প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

মুসলমানদের মুকাবিলায় বিজয়ী, ইসলামের হাতে পরাজিত ও বন্দী

সে যা-ই হোক, তাতারীরা ইরাক থেকে নিয়ে ইরান ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দখল করেছিল এবং স্বয়ং রাজধানী বাগদাদ ছিল তাদের দখলে। একটি অর্ধ-বন্য মূর্তিপূজারী জাতিগোষ্ঠীর পক্ষে মুসলিম জাহানের শিক্ষা ও সভ্যতা কেন্দ্রের ওপর দখল জমিয়ে বসে থাকা এমন একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিল যার প্রভাব গোটা মুসলিম জাহান, সমগ্র জীবন-যিন্দেগী, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ওপর পড়ছিল। মুসলিম জাহানে কোন শক্তি এমন ছিল না যা তাদেরকে ইরাক থেকে বেদখল করতে পারে, উৎখাত করতে পারে। এ সময় ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বশীকরণ শক্তির এক মু'জিযা প্রকাশিত হয় এবং কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় মুসলিম দাঈ ও মুসলমান দরবারী আমীর-উমারার মনোযোগ ও চেষ্টার ফলে তাতারী সুলতান ও আমীর-উমারার মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায়। আর এভাবেই এই অজেয় জাতিগোষ্ঠীকে জয় করে নেয় যারা সমগ্র মুসলিম জাহানকে একবার জয় করে নিয়েছিল। ঐতিহাসিক ইবন কাছীর ৬৯৪ হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনায় লিখেছেন:

"এ বছর চেঙ্গীয খানের প্রপৌত্র কাযান ইবন আরগূন ইব্ন ঈগা ইবন তূলী ইবন চেঙ্গীয খান তাতারীদের বাদশাহ হন এবং আমীর তূযূন (র)-এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতারীরা প্রায় সকলেই বা বেশির ভাগই ইসলামে দীক্ষিত হন। যেদিন বাদশাহ ইসলাম কবুল করেন সেদিন মানুষের ওপর স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোতি বর্ষণ করা হয়। বাদশাহ মাহমূদ নাম ধারণ করেন এবং জুমুআ ও খুতবায় শরীক হন। বহু পৌত্তলিক মন্দির তিনি ধ্বংস করেন এবং অমুসলিমদের ওপর জিযয়া কর ধার্য করেন। বাগদাদ ও অপরাপর শহর থেকে লুটকৃত জিনিসপত্র ফেরত দেয়া হয়। লোকেরা তাতারীদের হাতে তসবীহমালা দৃষ্টে আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য শুকরিয়া আদায় করে।"[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩ শ খণ্ড, ৩০৪ পৃ.।

মুসলিম জাহানে তাতারী হামলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

তাতারী আক্রমণের ফলে মুসলিম জাহানে এমন এক ধাক্কা লাগে যা সামাল দেবার জন্য বহু সময়ের দরকার ছিল। তাতারী হামলার ফলেই মুসলমানদের চিন্তা শক্তিতে নির্জীবতা ও উদাসীনতা এবং তবিয়তে হতাশা ও স্থবিরতা জন্ম নেয়। এই হামলার ফলে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, রচনা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ ও সামাজিকতা সব কিছুর ওপর প্রভাব পড়েছিল। জ্ঞান ও সাহিত্য ভাণ্ডারে নতুন নতুন দিক বিনির্মাণ, সংস্কার, নির্মাণ ও উন্নয়ন সাধনের পরিবর্তে এখন জ্ঞানী-গুণী ও দীন-ধর্মের ধারক-বাহকেরা কোনমতে বর্তমান পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের যুক্তিসম্মত করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মানব সভ্যতার এ ছিল এক বিরাট দুর্ভাগ্য যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর সেই সব মূর্খ ও বন্য জাতিগোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়েছিল যাদের না ছিল কোন আসমানী ধর্ম আর না তারা কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিরই মালিক ছিল। তাদের নেতৃত্বাধীনে কোন প্রকার জ্ঞানগত ও ধর্মীয় উন্নতির আশা করা যেতে পারে না। তাদের ইসলাম কবুলের পর যদিও মুসলমানরা তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাতের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও মিলেছিল, ইসলাম শাসক শ্রেণীর ধর্ম বনে গিয়ে ছিল, কিন্তু এই সব নও মুসলিম তাতারীদের মধ্যে আর যা-ই হোক, ধর্মীয় ও তত্ত্বগত নেতৃত্ব দেবার এবং ইসলামী ইমামতের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না। এই যোগ্যতা ও সামর্থ্য পয়দা হবার জন্য এক দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল। সেই মুহূর্তে এমন একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত উন্নত মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদ চরিত্রের অধিকারী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল যারা পতনোন্মুখ মুসলিম জাহানকে সামাল দিতে পারেন, তাদের মধ্যে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন এবং মুসলিম জাহানের নেতৃত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের কোশেশ করবেন।

নেতৃত্বের ময়দানে উছমানী তুর্কীদের আগমন

কিছুকাল পরেই হি. ৮ম শতাব্দীতে উছমানী তুর্কীরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয়। তারা দুনিয়াকে সাধারণভাবে ও মুসলমানদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে নিজেদের দিকে সেই সময় আকর্ষণ করে যখন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ হি. ৮৫৩/খ্রি.১৪৫৩ সালে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করে নেন। এই ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তুর্কীরা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উছমানী রাজবংশ-এর যোগ্য ছিল যে, তাদের

ওপর মুসলিম জাতির নেতৃত্বের ব্যাপারে, মুসলমানদের শক্তিকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে, দুনিয়ার বুকে তাদের হৃত সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা হবে। যে কনস্টান্টিনোপল বিগত আট শত বছর ধরে বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুসলমানদের নিকট অজেয় ছিল, তুর্কীরা তা-ই জয় করে। এটা ছিল তাদের পারঙ্গমতা, শক্তি-সামর্থ্য ও সাময়িক উদ্ভাবনী শক্তির চরমোৎকর্ষ লাভেরই প্রমাণবহ। তারা যে সামরিক শক্তি ও সমরোপকরণের ক্ষেত্রে সমকালীন-পৃথিবীর তামাম জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ ছিল এটা ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু তাদের মধ্যে এই সামর্থ্যও বিদ্যমান ছিল যে, তারা তাদের লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্ত জ্ঞান ও কর্মের শক্তি ও ইজতিহাদের দ্বারা কাজ নিতে পারে এবং জাতির যিনি নেতৃত্ব দেবেন তার জন্য এ সমস্ত গুণ থাকা অপরিহার্য শর্তও বটে।

পাশ্চাত্য লেখক Baron Carra de Vaux তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Islamic Thinkers-এর ১ম খণ্ডে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন:

"The victory of Mohammad, the Conqueror, was not a gift of fortune or the result of the Eastern Empire having grown weak, The Sultan had been preparing for it for a long time. He had taken advantage of all the existing scientific knowledge. The connon had just been invented and he decided to equip himself with the biggest cannon in the world and for this he acquired the services of a Hungarian engineer who constructed a connon that could fire a ball weighing 300 K.G's to a distance of one mile. It is said that this cannon was pulled by 700 men and took two hours to be loaded, Muhammad marched upon Constantiople with 3,00,000 soldiers and a strong artillery. His fleet, which besieged the city from the sea, consisted of 120 warships, By great ingenuity the Sultan resolved to send a part of his fleet by land. He launched seventy ships into the sea from the direction of Qasim Pasha by carrying them over wooden boards upon which fat had been applied (to make them slippery.)

"এই বিজয় কেবল ভাগ্যের জোরে কিংবা আকস্মিকভাবে হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি। আর এর কারণ কেবল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতাই ছিল না। আসল কারণ ছিল এই, সুলতান (মুহাম্মদ) অনেক আগে থেকেই এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন এবং তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতগুলো শক্তি ছিল সে সবের সাহায্য নিচ্ছিলেন। সে সময় নতুন নতুন কামান আবিষ্কৃত হচ্ছিল। তিনি সে যুগে যত বড় বিরাট ও শক্তিশালী কামান তৈরি করা সম্ভব তার জন্য চেষ্টা চালান। এজন্য তিনি হাঙ্গেরীর জনৈক ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগান। তিনি সুলতানের চাহিদানুযায়ী এমন একটি কামান তৈরি করেন যার সাহায্যে তিনশ

কিলোগ্রাম ওজনের গোলা এক মাইল দুরে নিক্ষেপ করা যেত। কথিত আছে, এই কামান টেনে নেবার জন্য সাত শত লোকের প্রয়োজন পড়ত এবং এতে গোলা ভর্তির জন্য দু'ঘণ্টা সময়ের দরকার হত। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য বহির্গত হন তখন তিন লক্ষ সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল আর ছিল বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী কামান বহর। 'একশ' বিশটি জাহাজসম্বলিত তাঁর নৌবহর কনস্টানিনোপলকে সমুদ্রের দিকে থেকে অবরোধ করে রেখেছিল। তিনি তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেন সামরিক বহরের একটি অংশ স্থলভাগ দিয়ে উপসাগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এ উদ্দেশে তিনি কাঠের গুড়িগুলোকে চেঁছে-ছুলে তার ওপর চর্বি মাখিয়ে তার ওপর দিয়ে জাহাজ বহর টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এভাবে কাসেম পাশার অধীনে ৭০টি জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়েছিলেন।"

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সম্পর্কে য়ূরোপ এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে, তাঁর ইনতিকালে রোমের পোপ আনন্দ উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিন দিন অব্যাহতভাবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করার নির্দেশ জারী করেছিলেন।[১]

তুর্কীদের বৈশিষ্ট্য

তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যদ্দরুন তারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবার অধিকার রাখত। তাঁদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

(১) তারা ছিল উন্নত মনোবলসম্পন্ন, উৎসাহদীপ্ত ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি জীবন্ত জাতি যাদের মধ্যে জিহাদী রূহ সক্রিয় ছিল এবং যারা বেদুঈন যিন্দেগী ও সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তাদের নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক রোগ-ব্যাধির হাত থেকে নিরাপদ ছিল যেসব রোগে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

(২) তাদের কাছে এমন সামরিক শক্তি ছিল যা দিয়ে তারা ইসলামের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য কেবল বজায় রাখতেই নয়, বরং চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ জাতিগুলোর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে পারে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে। একই সময় উছমানী সালতানাত তিনটি মহাদেশ অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ূরোপের বুকে রাজত্ব

১. ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী, মুহাম্মদ জামীল বেইহামকৃত, ২৭৪ পৃ. ;

করত। মুসলিম প্রাচ্য ইরান থেকে শুরু করে মরক্কো অবধি তাদের অধীন ছিল। এশিয়া মাইনরও তারা পদানত করেছিল এবং য়ূরোপে অগ্রাভিযান চালিয়ে তারা ভিয়েনার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। ভূ-মধ্যসাগরের ওপর ছিল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এর ওপর অন্য কোন জাতি কিংবা সাম্রাজ্যের কোন প্রভাব ছিল না।

রুশ সম্রাট পিটার দি গ্রেট-এর আস্থাভাজন এক বন্ধু একবার কনস্টান্টিনোপল থেকে সম্রাটকে লিখেছিলেন যে, সুলতান কৃষ্ণসাগরকে নিজের ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া সম্পদ মনে করেন যেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার নেই। তুর্কী নৌবহরের মুকাবিলা সমগ্র য়ূরোপ মিলেও করতে পারত না। ৯৪৫ হি/ ১৫৪৭ খ্রি. পোপের আহ্বানে ভেনিস, স্পেন, পর্তুগাল ও মাল্টার সম্মিলিত নৌবহর তুর্কী নৌবহরকে পর্যুদস্ত করার প্রয়াস পায়, কিন্তু নিদারুণভাবে পরাজিত হয়। সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে কি স্থলভাগে আর কি জলভাগে, সর্বত্র তুর্কীদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর আমলে উছমানী সালতানাতের সীমানা উত্তরে সাভা দরিয়া, দক্ষিণে নীল নদের উৎস মুখ ও ভারত মহাসাগর, পূর্বে ককেশাস পর্বতমালা ও পশ্চিমে আটলাস পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর শাসনাধীন এলাকা চার লক্ষ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তুর্কী নৌবহরে তখন তিন হাজার সামরিক জাহাজ। একমাত্র রোম ছাড়া প্রাচীন আমলের প্রায় সব বিখ্যাত শহরই ছিল তুর্কী সুলতানদের অধীন।[১]

সমগ্র য়ূরোপ তুর্কীদের ভয়ে কাঁপত। তাদের বড় বড় রাজা-বাদশাহরা তুর্কী সুলতানদের আশ্রয়ে থাকাকেই বেশি নিরাপদ ভাবত। তাদের সম্মানে গির্জায় ঘন্টা ধ্বনি থেমে যেত।

(৩) আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের উপযোগী সর্বোত্তম কৌশলগত ভৌগোলিক কেন্দ্রও ছিলো তাদের হাতে। তারা বলকান উপদ্বীপ থেকে একই সময় এশিয়া ও য়ূরোপের খবরদারি করতে পারত। তাদের রাজধানী ছিল কৃষ্ণসাগর ও মর্মর সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং য়ূরোপ ও এশিয়ার সঙ্গমস্থলে। ফলে একই সাথে তিন তিনটি মহাদেশের (য়ূরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা) খবরদারির জন্য এটাই ছিল সর্বোত্তম রাজধানী। তাই নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন ঃ

"If a World-Government ever came to be established, Constantinople alone would be an ideal capital for it."

অর্থাৎ যদি কোন দিন সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড সাম্রাজ্য কায়েম হয় তবে এর রাজধানী হিসেবে কনস্টান্টিনোপলই হবে সর্বোত্তম স্থান।

১. ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী, মুহাম্মদ জামীল বেইহামকৃত, ২৮০-১ পৃ.।